রক্তরাঙা দিনে

[ফরাসী বিপ্লবের রক্তক্ষরা পরিপ্রেক্ষিতে রচিত
ভিক্টর হুগোর বিখ্যাত উপন্যাস
Ninety Three অবলম্বনে]

অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্র দত্ত

বেংগল পাবলিশার্স
১৪, বংকিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক: শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে
ষ্ট্রীট, কলিকাতা
মুদ্রাকর: শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
ম্যাগনেট প্রেস ৩৫, দর্প নারায়ণ
ঠাকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ: বৈশাখ, ১৩৫৩
দাম পাঁচ সিকা

নানা ভাবে যাঁরা সাহায্য করেছেন:
অধ্যাপক সন্তোষ কুমার বসু
শিল্পী শৈল চক্রবর্তী
শ্রীযুক্ত বিমলা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ
শ্রীমান অরুণ কুমার চৌধুরী
ভারত ফোটো টাইপ ষ্টুডিও
বেংগল বাইণ্ডার্স

প্রাণাচার্য

শ্রীযুক্ত তারক নাথ পোদ্দার, এম্-এস্-সি, এম্-বি,

শ্রীচরণেষু

নববর্ষ, ৮৬ রবীন্দ্রাব্দ

১২/১, নাথের বাগান ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

এই লেখকের :

*

নতুন যুগের রূপকথা

(কিশোর মনের ঘুম ভাঙানো স্বপ্ন-কাহিনী)

*

অমর মরণ

(অগাষ্ট আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত অভিনব কিশোর উপন্যাস)

*

হে বীর কিশোর

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

(স্বপ্ন ও বাস্তবের সংঘাত দিয়ে গড়া গল্প-সংগ্রহ)

*

দুর্লভ শা'র বাড়ী

(অতীত বাংলার অলিখিত ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা)

*

ঘরছাড়া দিকহারা

(স্যার হল্ কেন রচিত বিখ্যাত উপন্যাসের কিশোর সংস্করণ)

*

রূপ কাহিনী

(আরব্য উপন্যাসের নতুন রূপ)

*

শিগগির প্রকাশিত হবে :

শেষ রাতের অতিথি

*

ঘুম ভাঙার গান

*

কিশোর সংঘ

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

পটভূমি ঃ ফ্রান্স ঃ ১৭৯৩

১৪ জুলাই, ১৭৮৯ ঃ ফরাসী রাজ-কারাগার বাস্টিলের পতন ঃ জন-নির্যাতনের অবসান।...

৪ অগাস্ট, ১৭৯০ ঃ সামন্ততন্ত্রের অবসান।...

জুন, ১৭৯১ ঃ ভারেনিস্ ঃ রাজতন্ত্রের অবসান।...

সেপ্টেম্বর, ১৭৯২ ঃ ফরাসী প্রজাতন্ত্রের জন্ম।...

১৭৯৩ ঃ গিলোটিনের খড়গতলে ফরাসী সম্রাট ষোড়শ লুইর প্রাণদণ্ড হলো ঃ ফরাসী বিপ্লবের প্রাণ-মন্ত্র সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বাণীতে সারা ইওরোপের রাজতন্ত্রের বুক উঠলো কেঁপে ঃ ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী পিটের নেতৃত্বে ইওরোপ জুড়ে গড়ে উঠলো বিপ্লববিরোধী ব্লক ঃ ইওরোপের লড়াই সুরু হলো ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ঃ ফ্রান্সের লড়াই প্যারি নগরীর বিরুদ্ধে ঃ বিপ্লবী ফ্রান্সের প্রাণ-কেন্দ্র প্যারি নগরী।...

স্বপ্ন-ভাঙা গণ-প্রাণ-স্রোত কিন্তু রুদ্ধ হলো না, হতে পারে না। সারা ইওরোপের বিরুদ্ধে জয়ী হলো ফ্রান্স ঃ ফ্রান্সের সংগ্রামে জয়ী হলো প্যারি ঃ জয়ী হলো বিপ্লবী গণ-পরিষদ ঃ কন্‌ভেন্‌শন।...

তাই ১৭৯৩ মানুষের ইতিহাসের একটি চরম ও পরম ক্ষণ। অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম বৎসর। ইওরোপ ঝাঁপিয়ে পড়লো ফ্রান্সের বুকে ঃ ফ্রান্স আক্রমণ করলো প্যারি। জগত-ইতিহাসের করুণতম ঘটনা। ঘটনার বৈচিত্র্যে এবং বীরত্ব, ত্যাগ ও ভাব-স্বপ্নের গভীরতায় ১৭৯৩-র ইতিহাস যে-কোন মহাকাব্যের উপযোগী।...

ঝড় উঠলো। কাঁপলো ঘর। ভাঙলো দেয়াল। বিক্ষুব্ধ হলো' দিগদিগন্ত। সাগর-ঈগলের মতো পাখা মেলে নতুন দ্বীপের প্রত্যাশায় বেপরোয়া পথে পাড়ি জমালো দুঃসাহসী বীর ম্যারাত...রোবেস্পিয়র...দাঁতন। গিলোটিনের কালো ছায়া পড়লো প্যারির পথে প্রান্তরে। রক্তস্রোতে ধুয়ে গেলো প্যারির ক্লেদাক্ত রাজপথ। সেই পথ একদা শেষ হলো কি নতুন দ্বীপে ? এলো কি নতুন মানুষ ?...

এমনি নানা প্রশ্ন ও জবাবের ঘাত-প্রতিঘাতে চিহ্নিত ১৭৯৩-র সারা অংগ। ১৭৯৩ আজো বেঁচে রয়েছে তাই সারা বিশ্বের কাছে একটা বিরাট প্রশ্ন-চিহ্ন হয়ে ঃ বিস্ময়, শ্রদ্ধা ও আতংকের জীবন্ত প্রতীক ১৭৯৩ !...

*　　*　　*　　*

—এক—

১৭৯৩।

মে মাসের শেষ।

লা সোদ্রার গহন অরণ্য।

শিকারী বাঘের মতো সতর্ক পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে একদল বিপ্লবী সৈন্য। সংখ্যায় প্রায় ত্রিশ। একটি স্বেচ্ছা-সেবিকাও আছে দলে।

ঘন জংগল। লতায় পাতায় ঢাকা। দশ পা দূরের মানুষ চোখে পড়ে না।

মাঝে মাঝেই ছড়িয়ে আছে শত্রুর আস্তানা গাড়ার চিহ্ন: পোড়া মাটি, সাদা ঘাস, তাঁবুর বাঁশ, গাছের ডালে রক্তের দাগ। মানুষের চিহ্ন আছে। মানুষ নাই। কোথায় তারা গেছে? হয়তো বহুদূরে। হয় তো কাছেই কোথাও আছে ওঁৎ পেতে। তাদেরি সন্ধানে এই অভিযান। তাই এতো সতর্ক পদক্ষেপ।

সহসা চমকে উঠলো সৈন্যদল। কার যেন নিশ্বাসের শব্দ শোনা যায়। সামনের গাছপালাগুলো যেন নড়ে উঠলো।

বেজে উঠলো সংকেত-ধ্বনি। সকলে একযোগে ঘিরে ফেললো জায়গাটা। সংগীন উঁচিয়ে এগিয়ে এলো চারদিক থেকে। বন্দুকের ঘোড়ার উপর ত্রিশটা আঙুল তৈরী।

স্বেচ্ছাসেবিকা এগিয়ে গেলো ঝোপের পাশে। ঝোপটা নড়ে উঠলো। সার্জেণ্টের ঠোঁটের কোণে উদ্যত আদেশ: ফায়ার…

স্বেচ্ছাসেবিকা চেঁচিয়ে উঠলো : থামো।

ফিরে দাঁড়িয়ে বললো : কমরেড, গুলি করো না।

তারপর ঢুকে গেলো ঝোপের ভিতরে।

ঝরা পাতার উপর বসে আছে একটি স্ত্রীলোক। একহারা গড়ণ। অল্প বয়স। জামা-কাপড় ছেঁড়া। মুখখানি বিষণ্ণ, ম্লান।

কোলে একটি ছোট মেয়ে। দুই হাঁটুর উপর ঘুমিয়ে আছে দুটি ছেলে।

স্বেচ্ছাসেবিকা বললো : এখানে কি করছ তুমি? তুমি কি পাগল যে এমন ভাবে এখানে লুকিয়ে আছ? আর একটু হলে যে গুলির ঘায়ে ছাতু হয়ে যেতে?

সার্জেণ্ট রাহুব এগিয়ে এসে বললো : তোমার নাম কি?

ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর এলো : মিসেল ফ্রেসার।

: তোমার কে কে আছে?

: কেউ নাই।

: স্বামী?

: তাকে মেরে ফেলেছে?

: কে মেরেছে? নীলকোর্তা, না সাদাকোর্তা?

: অত জানি না। একটা বুলেট এসে লাগলো। স্বামী আমার ছট্‌ফট্ করতে করতে মরে গেলো। এই মাত্র জানি

: তারপর?

: তারপর ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমি পালিয়েছি।

: কোথায় চলেছ?

: যে দিকে দুচোখ যায়।

: কোথায় ঘুমাও তোমরা রাতে?

: মাটিতে।

: কি খাও?

: কিছু না। না খাই। ঘাস, পাতা, ফল, মূল—যা পাই পথে তাই খাই।

: কিন্তু এমন ভাবে পালাচ্ছ কেন?

: না পালিয়ে কি করব? এরা সবাই যুদ্ধ করছে। চারদিকে গোলাগুলি ছুটছে। কি যে এরা চায় তাও বুঝি না। শুধু খুন আর খুন।

সার্জেণ্ট রাচুব বন্দুকের কুঁদো দিয়ে মাটিতে একটা আঘাত করে আপন মনেই বলে উঠলো: হায় রে যুদ্ধ! হায়রে মানুষের পাশবিক ব্যবহার! একটি বিধবা স্ত্রীলোক। তিনটি অসহায় শিশু। এদের সামনে শুধু সীমাহীন পলায়ন, সকলের উপেক্ষা আর একান্ত নির্জনতা। দিগন্ত কালো করে উঠেছে যুদ্ধের কালবৈশাখী। ক্ষুধায় অন্ন নাই। পিপাসার জল নাই। আকাশ ছাড়া কোন আশ্রয় নাই।

আরো কাছে যেয়ে সার্জেণ্ট কোলের মেয়েটির দিকে চেয়ে রইলো অপলক চোখে।

মেয়েটিও চেয়ে রইলো নীল চোখ মেলে। ঠোঁটে ফুটলো মিষ্টি হাসি।

সার্জেণ্ট চোখ ফেরালো। তার চোখের কোল বেয়ে মুক্তার মতো এক ফোঁটা জল এসে মোটা গোঁফের সাথে ঝুলছে।

সজল কণ্ঠে বললো রাতুব : কমরেড, আমাদের এই সৈন্য-দলই আজ হতে হোক এই পিতৃহীন তিন শিশুর আশ্রয়দাতা পিতা। তোমরা সম্মত? এই তিন শিশুকে আমরা পোষ্য নিলাম।

সৈন্যরা চীৎকার করে উঠলো : প্রজাতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক।

সার্জেণ্ট রাতুব মাকে বললো : আমার সংগে এসো, হে নাগরিকা!

—দুই—

১৭৯৩।

১লা জুন

সময়—সূর্যাস্ত। স্থান—ইংলিশ চ্যানেলের বুকে একটি ছোট দ্বীপ—জার্সি। চারদিক কুয়াসায় ঢাকা।

সেই কুয়াসার আবরণে একখানি জাহাজ জলে ভাসলো। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, জাহাজখানির নাম 'ক্লেমোর'; ইংরেজ নৌ-বহরের অধীন হলেও জাহাজের কর্মচারীরা সকলেই ফরাসী।

রহস্যময় 'ক্লেমোর'। বাইরে দেখতে একখানি সাধারণ বাণিজ্য-জাহাজ; কিন্তু আসলে মারণাস্ত্রে সজ্জিত রণতরী। যাত্রীদের সংখিপ্ত পরিচয়:

ক্যাপ্টেন: কাউন্ট দ্য বোয়াবার্তেলো।

সেকেণ্ড অফিসার: নাইট লা ভিভিল।

প্রধান নাবিক: ফিলিপ গাকোয়াল।

একদল ফরাসী অফিসার ও নাবিক: রনকুশল ও রাজ-ভক্ত।

অর্ধ-রেজিমেণ্ট নৌ-সৈন্য।

•

জাহাজ ছাড়বার ঠিক আগেই এসে উঠেছে একজন অপরিচিত যাত্রী। সংগে ছিলো জার্সি দ্বীপের গবর্ণর লর্ড

বাল্‌কারাস আর ফরাসী রাজবংশের যুবরাজ তুর্‌ দ্য অভেরইঞ; অতি সসম্মানে তার কেবিনের তত্ত্বাবধান করে গেলো যুবরাজের প্রধান গোয়েন্দা মঁসিয়ে গেলাম্বার স্বয়ং।

লোকটিকে দেখলেই মনে হয় দুঃসাহসী। বুড়ো মানুষ। যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া। কঠিন মুখশ্রী। মাথায় পাকা চুল। চোখে বিদ্যুত। বীর্যে যুবক। কর্তৃত্বে সে অশীতিপর বৃদ্ধ।

তার পরনে কৃষকের পোষাক। মাথায় সাধারণ একটা টুপি। কনুই ও হাঁটুর নিচে জামা ছিঁড়ে ছিঁড়ে গেছে—এতোই পুরাণো আর রঙচটা তার পোষাক। অথচ জাহাজ ছাড়বার সময় মঁসিয়ে দ্য গেলাম্বার এই 'কৃষক' লোকটাকে স্যালুট করলো ভক্তিভরে। লর্ড বাল্‌কারাস্‌ বললো: তোমার সৌভাগ্য কামনা করি সেনাপতি। আর যুবরাজ তুর্‌ দ্য অভেরইঞ বললো: বিদায় ভাই, বিদায়। আশ্চর্য!

দেখতে দেখতে নেমে এলো রাতের আঁধার। 'ক্রেমোর' অদৃশ্য হয়ে গেলো সাগরবুকে।

এক ঘণ্টা পরে।

মঁসিয়ে দ্য গেলাম্বার ডিউক-অব্‌-ইয়র্কের হেড-কোয়ার্টারে কাউণ্ট দ্য আর্তোকে সাদাম্পটন এক্সপ্রেস-যোগে একখানি চিঠি পাঠালো:

"মঁসিয়ে,—এই মাত্র জাহাজ ছেড়ে গেলো। জয় অনিবার্য। আট দিনের মধ্যে গ্রেনভিল হতে সেণ্ট ম্যালো অবধি সমগ্র তীরভূমিতে আগুন জ্বলে উঠবে।"

এই ঘটনার চারদিন আগে—

বিপ্লবীদের প্রতিনিধি প্রিউর গ্রেনভিলে বসে কোন গুপ্তচরের কাছ থেকে একটি নোট পেলো। নোটের হস্তাক্ষর পূর্বোক্ত চিঠির হস্তাক্ষরের সংগে হুবহু এক। নোটটি এই :

"নাগরিক প্রতিনিধি,—১ জুন জোয়ারের সময় রণতরী 'কেমোর' ছদ্মবেশের আবরণে যাত্রা করবে। ২ তারিখ সকালে 'কেমোর' হতে একটি লোক ফ্রান্সের উপকূলে অবতরন করবে। লোকটির বিবরণ : লম্বা, বুড়ো, পাকা চুল, কৃষকের পোষাক, ধনিকের চেহারা। ক্রুজারগুলিকে সতর্ক করো। রণতরী আটক করো। লোকটিকে গিলোটিনে ফেলো।"

* * * *

জাহাজ চলেছে।

কুয়াসাচ্ছন্ন আঁধারে দিগন্ত ঢাকা।

সেন্ট উয়েন ঘণ্টা-ঘরে ঢং ঢং করে দশটা বাজলো।

'কৃষক' লোকটি ডেক ছেড়ে কেবিনের দিকে পা বাড়ালো। দরজার সামনে দেখা হলো ক্যাপ্টেন ও সেকেণ্ড অফিসারের সাথে।

তাদের দিকে চেয়ে ফিস্ করে লোকটি বললোঃ সমস্ত ব্যাপারটা গোপন রাখা যে কতখানি দরকার তা আপনারা বোঝেন। যতক্ষণ না বিস্ফোরণ হচ্ছে, ততক্ষন সব চুপ। এখানে আপনারা দুজন ছাড়া আর তৃতীয় ব্যক্তি আমার নাম জানে না।

ঃ কবর পর্যন্ত এ-নাম আমি সাথে নিয়ে যাব।—বললো বোয়াবার্তেলো।

: আর আমি ?—বললো ভিভিল : মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়েও এ-নাম আমি বলব না।

লোকটি কেবিনে ঢুকলো।

ক্রমে রাত বাড়ে।

ডেকের উপর পায়চারি করে বেড়ায় ক্যাপ্টেন ও সেকেণ্ড অফিসার। নানা আলোচনা করে।

হঠাত একটা আর্ত চীৎকারে তাদের চমক ভাঙলো। সংগে সংগে কানে এলো একটা ভয়াবহ কলরব। জাহাজের গহ্বর থেকেই চীৎকার ও গোলমালের শব্দ আসছে।

শব্দ লক্ষ্য করে তারা ছুটলো কামান-সাজানো নিচের ডেকে। কিন্তু নামতে পারলো না। গোলন্দাজরা সব বেপরোয়া হয়ে উপরে উঠে আসছে।

সাংঘাতিক দুর্ঘটনা। আকস্মিক। প্রাণঘাতী।

একটি কুড়ি পাউণ্ডের গোলাবর্ষী কামান শিকল ছিঁড়ে স্থানচ্যুত হয়েছে।

সাগরবুকে এর চেয়ে ভীষণতর দুর্ঘটনা আর কিছু বুঝি হতে পারে না। কামানের শিকল খুলে গেলে হঠাত সেটা অতিপ্রাকৃত পশু হয়ে ওঠে। যন্ত্র হয় তখন যন্ত্র-দানব। তীরবেগে ছুটে চলে জাহাজের এক কোণ হতে অন্য কোণে ; চক্কর দেয় ঘূর্ণি-হাওয়ার বেগে ; লাফায় ; ভাঙে ; হত্যা করে ; ধ্বংস করে। চিরদিনের শৃংখলিত ক্রীতদাস যেন প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে।

দোষটি প্রধান গোলন্দাজের। কামানটা আটকে রাখবার শিকলের স্ক্রু-নাটটা অবহেলাবশত শক্ত করে আঁটা হয় নাই। তারই ফলে এই নারকীয় দুর্ঘটনা।

কিন্তু সে তো পরের কথা। দোষ-অপরাধের বিচার হবে পরে। এখন উপায় কি? এ ধ্বংস-দূতের গতিরোধ হবে কেমন করে?

একে একে পাঁচজন নাবিক এরি মধ্যে যন্ত্র-দানবের করাল নিষ্পেষণে ছিন্ন-বিছিন্ন দেহে মরণকে বরণ করেছে। কয়েকটি ছোট কামান চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। জাহাজের খোলও কয়েক জায়গায় জখম হয়েছে। তবু ভাগ্য ভালো যে জল-রেখার উপরে ফাটলগুলি হয়েছে। নইলে তো এতক্ষণ হুহু করে জল ঢুকতো জাহাজে। আর তাই বা ঢুকতে কতো ক্ষণ? ইস্পাতী ঘোড়ার এই অন্ধ আস্ফালন আরো কিছুকাল চললে, 'ক্লেমোর'-এর সলিল সমাধির আর কতো দেরী?

সারা জাহাজ আতংকে কাঁপছে। ক্যাপ্টেন বোয়াবার্তেলো ও লেফটেন্যান্ট ভিভিল নতমুখে দাঁড়িয়ে আছে সিঁড়ির মাথায়।

কে-একজন দুই হাতে তাদের সরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলো। এ সেই রহস্যময় যাত্রী—'কৃষক' মানুষ।

সিঁড়ির ঠিক নিচেই সে চুপ করে দাঁড়ালো।

ইস্পাতী পশুর নর্তন, কুর্দন ও গর্জন চলেছে অবিরাম। সারা ডেকময় সে ছুটে বেড়াচ্ছে। মাথার উপরে ছোট লণ্ঠনটা কাঁপছে। সেই কাঁপা আলোয় আর আঁধারে ডেকের দৃশ্য হয়ে উঠেছে প্রেতভূমির মতো—বীভতস, ভয়ংকর।

ক্যাপ্টেন আদেশ দিলো,—উপরে যা কিছু ভারী জিনিষ আছে, কামানের চাকার নিচে ফেলে দাও, তাতে যদি এর গতি রোধ হয়।

মাদুর, পালের চট, গুটানো দড়ি আর আজে-বাজে জিনিষের স্তূপ জমে উঠলো। গাঁটের পর গাঁট জাল-নোট ফেলে দেওয়া হলো। কিন্তু তাতে কি হবে? সেগুলিকে ঠিক জায়গায় দেয় কে?

ক্রমে জাহাজের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠলো। বড় মাস্তলটি একেবারেই অকেজো হবার জোগাড়। ত্রিশটা কামানের দশটা নষ্ট হয়ে গেছে। জাহাজের খোলে চিড় ধরে একটু একটু করে জল ঢুকছে। সলিল-সমাধি অনিবার্য।

বৃদ্ধ যাত্রী পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। নিশ্চল। নির্বাক। নিরুপায়।

সহসা একলাফে নিচে নেমে এলো আর একটি মানুষ। তাহার একহাতে একখণ্ড লোহা, অপর হাতে ফাঁস-কল করা একগাছা দড়ি।

এই মানুষটিই প্রধান গোলন্দাজ—এরই ত্রুটির ফলে এই দুর্ঘটনার সূত্রপাত। এতগুলো মানুষের এই সমূহ মুস্কিলের জন্যে দায়ী সে, সেই এর আসান করবে। হয় লোহার ডাণ্ডাটা কোন রকমে ঢুকিয়ে দেবে কামানের চাকার মধ্যে; না হয় দড়ির ফাঁস-কলটা পড়িয়ে দেবে কামানের মুখে। ব্যাস্। তাহলেই কায ফতে!

সুরু হলো সংগ্রাম: কামানের সংগে গোলন্দাজের; বস্তুর সংগে বুদ্ধির; নিষ্প্রাণের সংগে প্রাণবানের সংঘর্ষ।

কামানটা ছুটে আসে শিং-উঁচুনো বুনো মোষের মতো। গোলন্দাজ শাঁ করে পাশ কাটিয়ে সরে যায়। আর সুযোগের অপেক্ষা করে।

হঠাত একবার কামানটি এমনভাবে রুখে এলো যে গোলন্দাজের আর পাশ কাটবার জায়গা রইলো না, ফুরসুতও নাই।

হায়! হায়! হায়!

সকলে একসংগে চীৎকার করে উঠলো।

বৃদ্ধ যাত্রীটি ঝড়ের চেয়ে ক্ষিপ্রতর গতিতে লাফ দিয়ে সামনে এলো। এক গাঁট নকল নোট দুই হাতে তুলে বিদ্যুৎবেগে ছুঁড়ে দিলো কামানের চাকার ভিতরে। ফল হলো বিস্ময়কর। যে কামানের উদ্যত আক্রমণে দুজনেরই মৃত্যু ছিল অনিবার্য, নকল-নোটের গাঁট কীলকের মতো তার চাকাকে আটকে দিলো। সেই সুযোগে গোলন্দাজ লোহার ডাণ্ডাটি ঢুকিয়ে দিলো পিছনের চাকার স্পোকের ভিতরে। কামান থামলো। তৎক্ষণাৎ সে ফাঁস-কলটি পরিয়ে দিলো পরাজিত দানবের ইস্পাতী গলায়। লোকজন সব ছুটে এলো দড়ি-দড়া ও শিকল নিয়ে। হলো রণজয়।

গোলন্দাজ এগিয়ে এসে বৃদ্ধ যাত্রীকে স্যালুট করলো: আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন হুজুর।

বৃদ্ধের মুখ ভাবলেশহীন। কোন উত্তর সে দিলো না।

এগিয়ে এলো কাউন্ট দ্য বোয়াবার্তেলো। বললো: সেনাপতি, এই লোকটি যা করেছে সে জন্যে ওকে কি পুরস্কৃত করা উচিত নয়?

বৃদ্ধ জবাব দিলো : নিশ্চয়।

: তাহলে আদেশ করুন।

: আদেশ করবেন আপনি। আপনি ক্যাপ্টেন।

: কিন্তু আপনি সেনাপতি।

গোলন্দাজের দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধ বললো এগিয়ে : এসো।

কাউন্টের গায়ে ছিলো ক্যাপ্টেনের ইউনিফর্ম। সেখান থেকে সেণ্ট লুইর ক্রস-চিহ্নটি খুলে নিয়ে বৃদ্ধ সেটাকে পরিয়ে দিলো গোলন্দাজের জামায়।

সকলে চেঁচিয়ে উঠলো : হুররা—

বিহ্বল গোলন্দাজের দিকে তর্জনী তুলে বৃদ্ধ আবার কথা বললো : এইবার একে গুলি করে মারো।

উল্লাস আতংকে স্তব্ধ হলো।

বৃদ্ধের গলা শোনা গেলো আবার : একটি মাত্র ত্রুটিতে এই জাহাজ আজ বিপন্ন। হয়তো এর ধ্বংসই হবে। শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যে কোন গুরুতর অপরাধেরই শাস্তি মৃত্যু। বীরত্বের পুরস্কার আছে। কর্তব্যে ত্রুটির আছে শাস্তি। সৈন্যগণ, তোমাদের কর্তব্য শেষ করো। এর শাস্তি মৃত্যু।

কয়েক মিনিট পরে।

হঠাৎ একটু আলোর ঝলকানি। রাইফেলের একটি আওয়াজ। সাগরের জলে একটি 'ঝপাত' শব্দ। আর সব চুপ।

বৃদ্ধ যাত্রী মাস্তুলে হেলান দিয়ে তখনো দাঁড়িয়ে আছে। বুকের উপর দুই হাত জড়ানো। কপালে নীরব চিন্তার কুঞ্চনরেখা।

দূরে ঝড়ের আর্তনাদ।......

—তিন—

আবার বিপদ।

'ক্লেমোর'-এর অবস্থা শোচনীয়। জাহাজের পাঁচ জায়গায় চিড় ধরেছে। অবিলম্বে সেগুলি মেরামত করতে হবে। ত্রিশটা কামানের মধ্যে একুশটা অকেজো হয়ে গেছে। কামান-সাজানো-ডেকের অবস্থা পাগলা হাতীর খাঁচার চেয়েও দুর্দশাগ্রস্ত।

এদিকে সকলের অজ্ঞাতে জাহাজ বাতাসের বেগে ভেসে গেছে বিপথে। চারদিকে উন্মত্ত সাগর। বাতাসে ঝড়ের গর্জন। ঝলকে ঝলকে জল উঠছে জাহাজে। তরংগ ভীষণ।

উপরের ডেকে দাঁড়িয়ে তিন মূর্তি : বুড়ো যাত্রী, ক্যাপ্টেন ও ভিভিল।

রাতের আঁধার কেটে গেলো।

পূর্ব-দিগন্তে ঊষার আভাস।

পশ্চিম-দিগন্তে বিদায়ী চাঁদের ম্লান আলো।

উভয় দিগন্তের আলো-আঁধারের পটে আঁকা পড়েছে দুটি বিরাট-দেহ ছায়ামূর্তি।

পশ্চিমে আকাশ-ছোঁয়া পর্বতের সারি।

পূর্বে ফরাসী ক্রুজার-বাহিনীর আটখানি রণতরী পরপর সাজানো।

ডেকের উপর ত্রিমূর্তির বুক কেঁপে উঠলো।

এ যে উভয়-সংকট। কুখ্যাত ওই পাহাড়ের নিচে জাহাজ চালালে জাহাজডুবী অনিবার্য। সামনে এগিয়ে গেলে সুসজ্জিত নৌ-বহরের হাতে ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। মরণ সম্মুখে—মরণ পশ্চাতে। কোথায় পথ ?

লা ভিভিল হতাশ-আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলো: এ-পথে ডুববে জাহাজ—ও পথে গর্জাবে কামান। একি পাথর-চাপা বরাত রে বাবা !

চোখ থেকে দূরবীনটা নামিয়ে বোয়াবার্তেলো এগিয়ে এলো বুড়ো যাত্রীর পাশে। বললো: স্যার, আমরা প্রস্তুত। ভাঙা জাহাজটাকে যথাসম্ভব মেরামত করা হয়েছে। জানি, মৃত্যু অনিবার্য। তবু আমরা যুদ্ধই করব। মরতে যখন হবেই তখন ঢেউয়ের চেয়ে কামানের গোলাই ভাল। জলের চেয়ে আগুনই আমি ভালবাসি। মৃত্যুই আমাদের ভাগ্যলিপি। কিন্তু আপনার নয়। আপনি রাজ-প্রতিনিধি। আপনার কায অনেক বড়—ভাঁদির যুদ্ধ পরিচালনা। আপনার মৃত্যুতে রাজতন্ত্রের অবসান। সুতরাং বাঁচতে আপনাকে হবেই। একখানি নৌকা ও একজন নাবিক আপনাকে দিচ্ছি। এই মুহূর্তে আপনি জাহাজ ত্যাগ করুন।

বৃদ্ধ যাত্রী কোন কথা বললো না। কেবল সম্মতি জানিয়ে একবার ঘাড় নাড়লো।

আবার ধ্বনিত হলো ক্যাপ্টেনের কণ্ঠস্বর: সৈনিক ও নাবিকগণ,—এই লোকটি রাজার প্রতিনিধি। আমাদের

হাতে এঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, আমরা এঁকে বাঁচাব। সুদক্ষ সেনাপতি ইনি। ভাঁদির রণক্ষেত্রে ইনিই হবেন আমাদের নায়ক। আমাদের সবাইকে নিয়ে এঁর ফ্রান্সের মাটিতে পা দেবার কথা ছিলো। আমাদের ছাড়াই এঁকে নামতে হবে। মাথা যদি বাঁচে তাহলে সবই বাঁচলো।

সকলে সমস্বরে বললো : ঠিক—ঠিক—

ক্যাপ্টেন সামনের দিকে চেয়ে বললো : সম্মুখে তরংগ সংকুল সমুদ্র। ছোট একখানি নৌকা নিয়ে পার হতে হবে ইংলিস চ্যানেল। কে আছ দুঃসাহসী নাবিক, এগিয়ে এসো।

দৃঢ়দেহ একজন নাবিক এলো এগিয়ে : আমি আছি।

যাত্রা সুরু হলো।

অনুকূল ঢেউয়ে দেখতে দেখতে নৌকাখানি জাহাজ থেকে অনেক দূরে ছিটকে পড়লো।

সহসা বেজে উঠলো রণভেরী।

বাতাসে ভেসে এলো বোয়াবার্তেলোর কঠিন কণ্ঠস্বর : সৈন্যগণ, মাস্তুলের মাথায় শ্বেত পতাকা ওড়াও! কে জানে, হয়তো এই আমাদের জীবনের শেষ সূর্যোদয়!

'ক্লেমোর'-এর কামান গর্জে উঠলো।

মিলিত কণ্ঠে উঠলো জয়ধ্বনি : রাজা দীর্ঘজীবী হোক।

পূর্ব-দিগন্ত হতে এলো সুস্পষ্ট জবাব : প্রজাতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক।

তার সংগে সুর মিলালো শত কামানের ভৈরব গর্জন !

সুরু হলো সংগ্রাম।

ধোঁয়া আর আগুনে ছেয়ে গেলো আকাশ-সাগর।

*　　*　　*　　*

দিনের আলোয় দেখা গেলো দুইজন যাত্রী নিয়ে নৌকা ভেসে চলেছে !

নাবিকের বয়স প্রায় ত্রিশ। তামাটে কপাল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। কোমরের বেল্টে দুটো পিস্তল। হাতে দাঁড়।

বুড়ো যাত্রীর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে নাবিক বললো : যাকে গুলি করে মারবার আদেশ আপনি দিয়েছেন, আমি তার ভাই।

ধীরে ধীরে মাথা তুললো বুড়ো : কে তুমি ?

: এই তো বললাম।

: কি চাও ?

: আপনাকে খুন করতে।

: কেন ?

: কারণ আপনি আমার ভাইকে খুন করেছেন।

: আমি তাকে খুন করি নি।

: তবে কে করেছে ?

: তার নিজের দোষ।

নাবিক হাঁ করে চেয়ে রইলো।

বুড়ো শুধালো : তোমার নাম কি ?

: হাল্‌মালো। কিন্তু কি হবে আমার নামে। মরবার জন্যে প্রস্তুত হোন মালিক।

হাল্‌মালোর হাতে উদ্যত পিস্তল।

: তুমি আমাকে 'মালিক' বললে কেন ?

: বারে, আপনাকে দেখেই বোঝা যায় আপনি একজন 'মালিক'—সম্ভ্রান্ত লোক।

: তোমার 'মালিক' আছেন ?

: নিশ্চয়। তিনি খুব বড়ো জমিদার। মস্ত বড়ো বংশ।

: তিনি কোথায় ?

: তা জানি না। এ-দেশ তিনি ছেড়েছেন। তার নাম মার্কুইস দ্য লাঁতিনাক—ভাইকাউন্ট দ্য ফঁতিনা; তিনি 'সাত বনের রাজা'।

: তিনি যদি সামনে এসে দাঁড়ান, তুমি তার কথা শুনবে।

: নিশ্চয়। সর্বপ্রথম আমি ভগবানের দাস; তারপর রাজার দাস। কিন্তু কি হবে এ-সব বাজে কথায়। আপনি আমার ভাইকে মেরেছেন—আমি আপনাকে মারব।

নাবিক পিস্তল তুলে ধরলো।

বুড়ো সোজা হয়ে দাঁড়ালো। ভয়লেশহীন মুখে বললো: এখনো ভেবে দেখো, আমাকে খুন করলে তুমি নিজেকেই খুন করবে।

: মানে ?

: দেখো, তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করো। তুমি ঈশ্বরের দাস। কিন্তু জানো কি যে, আঘাতে আঘাতে ঈশ্বরের বুক আজ

ক্ষতবিক্ষত। ঈশ্বরের পুত্র ফরাসীরাজ আজ কারাগারে বন্দী। তাঁর নির্যাতন যে ঈশ্বরেরই নির্যাতন। কলুষিত গীর্জা আর নিহত পুরোহিতদের আর্ত কণ্ঠে ধ্বনিত হয় ঈশ্বরের কাতর আর্তনাদ। সে আর্তনাদ কি তোমার কানে পৌঁছে?

নাবিক চিন্তায় নতমুখ।

: আমরা চাই লাঞ্ছিত ঈশ্বর-পুত্রদের রক্ষা করতে। তাই এই যুদ্ধের আয়োজন। কিন্তু সব পণ্ড করে দিলো তোমার ভাই; সে যদি ঠিক মতো কায করতো, 'ক্লেমোর' রণতরী তাহলে এমন ভাবে অপঘাতে মরতো না; বিজয় গৌরবে আমরা এতক্ষণ ফ্রান্সের মাটিতে পা দিতাম,—হাতে উন্মুক্ত কৃপাণ, চোখের সামনে শ্বেত পতাকা। আমরা সাহায্য করতাম ভাঁদির বীর কৃষকদের; রক্ষা করতে পারতাম ফ্রান্সকে—ফ্রান্সের রাজাকে। সেই হলো ঈশ্বরের কায। আর এখন? এখনও আমি একা চলেছি সেই মহান কর্তব্যভার মাথায় নিয়ে। অথচ তুমি আমাকে বাধা দিচ্ছ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের—নরঘাতীদের বিরুদ্ধে রাজার—শয়তানের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের এই সংগ্রামে, তুমি নিচ্ছ শয়তানের পথ। তোমার ভাই ছিলো শয়তানের প্রথম সহচর, তুমি দ্বিতীয় সহচর। সে করেছিলো সুরু, তুমি করতে চাও শেষ। করো। আমাকে মেরে ফেলো। গ্রামে গ্রামে আগুন জলে উঠুক। প্রতি পরিবারে উঠুক ক্রন্দনের রোল। পুরোহিতদের বুক রক্তাক্ত হোক। রাজা থাক চিরবন্দী লৌহ-কারাগারে। যীশু ক্রুশবিদ্ধ থাক চিরদিন তরে।······মারো। আমাকে মারো। নিরস্ত্র আমি। তোমার অস্ত্রাঘাতে আমাকে হত্যা করো।

বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর আবেগে কাঁপছে। চোখে জ্বলছে আত্ম-প্রত্যয়ের দৃঢ়তা। বুকে দৃপ্ত তেজ।

শুনতে শুনতে হালমালোর মুখ সাদা হয়ে গেছে। শরীর কাঁপছে ঝড়ের পাতার মতো।

বুড়োর দুই পা জড়িয়ে ধরে সে কেঁদে উঠলো : দয়া করুন প্রভু, ক্ষমা করুন। আমি অন্যায় করেছি। আমার ভাই অপরাধী। তার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত আমি করব। আপনার সকল আদেশ আমি নতমস্তকে পালন করব।

: আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম।

নৌকা ভেসে চলেছে।

দিন গেলো। রাত্রি এলো। আবার এলো দিন। দিন ফুরালো।......

নৌকাটাকে যথাসম্ভব ঠেলে দিয়ে দুজনে তীরে নামলো। বুড়ো লোকটি একখানি বিস্কুট তুলে পকেটে রাখলো। বাকি বিস্কুট ও মাংস ব্যাগে ভরে হালমালো সেটাকে কাঁধে ফেললো।

পথে নেমে শুধালো : মঁসিয়ে, আমি আপনার আগে যাব, না পিছনে ?

: কোনটাই নয়। এইবার আমরা বিদায় নেবো।

একটু থেমে বুড়ো পকেট থেকে বের করলো সবুজ সিল্কের একখানি গিঁট-দেওয়া রুমাল। মাঝখানে সোনার সুতায় fleur-de-lis অক্ষর ক'টি লেখা।

বুড়ো শুধালো : তুমি পড়তে জানো ?

: না।

: ভালই হলো। লেখাপড়া জানা লোক বড়ো জঞ্জালে. শোন মন দিয়ে।

: বলুন।

: তুমি যাবে ডাইনে। আমি বাঁয়ে। যেতে যেতে এক সময় পাবে সেণ্ট রুইল ও প্লেডিয়াকের মাঝখানে পাহাড়ের কোনে একটা মস্ত বাদাম গাছ। সেইখানে থামবে। চারদিকে চেয়ে দেখবে—কেউ কোথাও নাই। তখন করবে সংকেত-ধ্বনি। জানো তো সংকেত-ধ্বনির কৌশল ?

হালমালো ঘাড় নাড়লো। দুটো আঙুল মুখে পুরে প্যাঁচার মতো ডেকে উঠলো : টু-হুইট—টু—হু-উ-উ—

বুড়ো খুসি হয়ে বললো : বেশ বেশ। এমনি শব্দ তিনবার করতেই যেন মাটি ফুঁড়ে একটি মানুষ হাজির হবে। তার নাম প্লাঁসেনা। এই নিদর্শন দেখালেই সে সব বুঝতে পারবে।

fleur-de-lis…লেখা নিদর্শনটি বুড়ো এবার হালমালোকে দিলো। ভক্তিভরে নিয়ে সেটাকে সে সযত্নে বুকের কাছে রেখে দিলো।

: সেখান থেকে তুমি যাবে আস্তিলের জংগলে। সেখানে দেখা পাবে খোঁড়া মুস্কেতোঁর। তারপর যাবে কুস্‌বোঁতে। সেখান থেকে রুগেফ্‌। ভালো কথা। তুমি লা তুর্গ্‌ চেন ?

: লা তুর্গ্‌ আবার চিনি না। সেখানেই তো আমার মালিকদের মস্ত বড়ো দুর্গ। দুর্গের দুটো ভাগ—নতুন আর

পুরানো। মাঝখানে একটা লোহার দরজা। এতো শক্ত যে কামানের গুলি হার মানে তার কাছে। সেই দুর্গের নিচে আছে গুপ্ত সুরংগ। আমি সব জানি।

বৃদ্ধ লোকটি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলো: গুপ্ত সুরংগ? তুমি বলছো কি?

: আজ্ঞে ঠিকই বলছি। পুরাকালে যখন লা তুর্গ দুর্গ অবরোধ করা হয়েছিলো, সেই সময় এই গুপ্ত-পথ তৈরী হয়েছিল। এ-কথা কেউ জানে না। কেবল আমার বাবা জানতেন। তিনিই আমাকে সে-পথ দেখিয়েছিলেন। সুরংগ পথে একটি পাথর আছে, সেটি আপনি নড়ে—

বুড়ো এবার হেসে উঠলো: হেঃ, কতো কথাই যে তোমরা জানো। পাথর নড়ে, পাথর গান গায়, পাথর রাত্তির করে ঝর্ণায় যেয়ে জল খায়। যতো সব বাজে—

: কিন্তু—

বুড়ো একটা ঘাড় ঝাকুনি দিয়ে বললো: ওসব বাজে কথা থাক। এখন কাযের কথা শোনো। এমনি করে এই নিদর্শন আর সংকেত-ধ্বনির সাহায্যে সব জায়গায় তুমি ছড়িয়ে বেড়াবে আমার আদেশ: ওঠো—অস্ত্র নাও—ধ্বংস করো।··· পর্বতে-কন্দরে, বনে-বনান্তরে, ফ্রান্সের সকল স্থানে তুমি ঘুরবে। সব্বাইকে বলবে প্রস্তুত হতে। এক মাসের মধ্যে পাঁচ লক্ষ সৈন্য আমি চাই। ফ্রান্সের প্রতি বনে জংগলে তারা লুকিয়ে থাকবে শিকারী বাজ পাখীর মতো। বিপ্লবী বাহিনী আমাদের শীকার।···সবাইকে আরো জানাবে, ইংরেজ আমাদের সহায়।

তুই আগুনের মাঝে ফেলে প্রজাতন্ত্রকে আমরা পুড়িয়ে মারব। ইওরোপ আমাদের সহায্যে করবে। বিপ্লবের অবসান হবেই। বুঝেছ?

আজ্ঞে হাঁ।

: বেশ। এইবার তবে রওনা হও।

: আবার কোথায় মঁসিয়ের দেখা পাবো?

: যেখানে আমি থাকবো।

: কি করে জানবো আমি?

: সারা জগত সেদিন আমার কথা জানবে।

: বুঝেছি।

: বেশ। ঈশ্বর তোমার সহায় হোন। যাও।

: আপনার আদেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো।

: বেশ।

: যদি সফল হই—

: পুরস্কার পাবে।

: আমার ভাইয়ের মতো। আর যদি সফল না হই, আমাকে গুলি করবেন তো?

: ঠিক তোমার ভাইয়ের মতো।

: ব্যস—ব্যস্ মঁসিয়ে।

বৃদ্ধ আত্ম-চিন্তায় বিভোর। তার মুখ নুয়ে পড়েছে। খানিক পরে চোখ তুলে দেখলো সে একা দাঁড়িয়ে। হালমালো অনেক দূরে—চলেছে এগিয়ে।

সূর্য পাটে নামছে।

—চার—

সামনেই একটা উঁচু বালিয়াড়ি।

বুড়ো লোকটি বালিয়াড়ি বেয়ে উঠলো তার মাথায়।

দূর অতীতে কবে সেখানে গড়া হয়েছিলো একটি স্মৃতি-স্তম্ভ। তাইতে হেলান দিয়ে বুড়ো বসলো। তাঁর পায়ের নিচে চারদিক জুড়ে দিগন্তবিতত ভূমিখণ্ড।

গোধূলির ম্লান আলোয় প্রকৃতি রহস্যময়। শান্ত। স্তব্ধ। কানে আসে সাগর-বাতাসের হা-হা স্বর।

হঠাৎ সে চমকে উঠলো।

দিগন্তে নিবদ্ধ তাঁর দৃষ্টি।

সম্মুখে কর্‌মেরা ঘণ্টা-ঘর। বেশ খানিকটা দূরে। তবু স্পষ্ট চোখে পড়ে।

তার মাথায় ঘণ্টার খাঁচাটি অনবরত দুলছে না? তাইতো। নইলে ওর মুখটা পর পর খুলছে আর বুঁজছে কেন? এইমাত্র পিছনের লাল আকাশ দেখা গেলো ওর ভিতর দিয়ে। আবার দেখা গেলো না। এই আলো—এই আঁধার।

বুড়ো তাকালো ডাইনে। বাগুর-পিকান ঘণ্টা-ঘর। আশ্চর্য। এটাও ঠিক একি ভাবে দুলছে।

আবার সে তাকালো বাঁয়ে। তানিস্ ঘণ্টা-ঘর। এটাও দুলছে।

একে একে আশেপাশের সবগুলি ঘণ্টা-ঘর সে পরীক্ষা করলো। সবগুলি দুলছে।

এর মানে কি ?

নিশ্চয় ঘণ্টাগুলো কেউ বাজাচ্ছে একযোগে।

নিশ্চয় এ কোন বিপদ-সংকেত।

চারদিক থেকে, সমস্ত ঘণ্টা-ঘর থেকে, সবগুলি গ্রাম থেকে একযোগে বাজছে বিপদ-সংকেত। কিন্তু কোন শব্দ সে শুনতে পায় নি, এখনো পাচ্ছে না। কারণ সাগর-বাতাসে শব্দ ভেসে যাচ্ছে উল্টো পথে।

তাই বিপদ-সংকেত তাঁর চোখে ভাসছে, কানে আসছে না।

কিন্তু কেন এই সংকেত ?

কার বিরুদ্ধে এই আয়োজন ?

আমার বিরুদ্ধে কি ?—বৃদ্ধের লোহার মতো শরীরের ভিতর দিয়েও বুঝি একটা ঠাণ্ডা স্রোত শিরশির করে বয়ে গেলো।

এরা কি আমাকে চিনতে পেরেছে ? স্থানীয় গণ-প্রতিনিধি কি আগেই পেয়েছে আমার আসার খবর ?

তাও তো সম্ভব নয়।

'ক্লামোর' ডুবে গেছে অতল জলে। একটি প্রাণীও তার রক্ষা পায় নাই। তবে ? কে দেবে সংবাদ ?

মাথার উপর কি যেন ফর্‌ফর্‌ করছে। ঝরা পাতার শব্দ কি ?

বুড়ো উঠে দাঁড়ালো।

স্মৃতি-স্তম্ভের অপর পিঠে একখানি বিজ্ঞাপনের কাগজ

লটকানো। এইমাত্র কে বুঝি লটকে রেখে গেছে। আঠা এখনো শুকায় নাই। তারি খানিকটা বাতাসে খুলে যেয়ে ফর্‌ফর্‌ শব্দ হচ্ছে।

রুদ্ধ নিশ্বাসে বুড়ো বিজ্ঞাপনটি পড়ে ফেললো :

— ফরাসী প্রজাতন্ত্র এক ও অখণ্ড —

'সেরবুর্গ উপকূলস্থ গণ-বাহিনীর অস্থায়ী প্রতিনিধি আমরা এই বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিতেছি :

'ভূতপূর্ব মার্কুইস দ্য লাঁতিনাক গোপনে গ্রেনভিল উপকূলে অবতরণ করায় আমরা তাহাকে গণ-শত্রু বলিয়া ঘোষণা করিতেছি। যে-কেহ জীবিত বা মৃত অবস্থায় তাহাকে ধরিয়া আনিতে পারিবে, তাহাকে ষাট হাজার ফ্রাঁ পুরস্কার দেওয়া হইবে। সেরবুর্গ উপকূল-বাহিনীর একটি দলকে শীঘ্রই নামমাত্র মার্কুইস লাঁতিনাককে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পাঠানো হইতেছে।

'পল্লীবাসীদিগকেও এই ব্যাপারে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে আদেশ দেওয়া হইতেছে।

'১৭৯৩ সালের ২রা জুন তারিখে গ্রেনভিল টাউন-হল হইতে প্রচারিত।

(স্বাক্ষর) প্রিউর দ্য লা মার্ন'

এর নিচে আরো খানিকটা লেখা ছিলো ছোট অক্ষরে। স্তিমিত আলোয় বুড়ো সে-লেখা পড়তে পারলো না।

আর এখানে দেরী করা উচিত নয়।

দ্রুত পদক্ষেপে বুড়ো বালিয়াড়ি থেকে নিচে নেমে এলো।

সামনেই পায়ে-চলা ছোট পথ। নির্জন।

তাড়াতাড়ি ওভারকোটটা উল্টো করে গায়ে চড়িয়ে বুড়ো পা বাড়ালো।

চাঁদ উঠেছে।

তে-মাথার মোড়ে একটা পাথরের ফলক। তার গায়ে একখানা বিজ্ঞাপনের কাগজ লটকানো। বুড়ো এগিয়ে এলো।

কে যেন বললো : কোথায় যাচ্ছেন ?

বুড়ো পিছন ফিরলো।

আর এক বুড়ো। তারি মতো লম্বা, তারি মতো বুড়ো, তারি মতো পাকা চুল। পোষাক আরো ছেঁড়া। হাতে লম্বা লাঠি।

নবাগত শুধালো : আমি জিজ্ঞেস করি, কোথায় চলেছেন আপনি ?

: তার আগে আমার কথার জবাব দাও। আমি কোথায় ?

: আপনি এখন তানিসে। আমি এখানকার এক ভিখারী। আপনি এ-জায়গার মালিক।

: আমি ?

: হ্যাঁ। আপনি মালিক মার্কুইস দ্য লাঁতিনাক।

মার্কুইস দ্য লাঁতিনাক শান্তকণ্ঠে বললো : বুঝেছি। দাও আমাকে ধরিয়ে।

বুড়ো বললো : এখানে আমরা দুজনেই নিরাপদ। আপনি দুর্গে, আর আমি জংগলে।

ঃ ও সব কথা থাক। তোমার কায শেষ করো। চলো কোথায় নিয়ে যাবে।

ঃ আপনি তো যাচ্ছিলেন হার্বে-অঁ-পাইল গোলাবাড়ীর দিকে?

ঃ হাঁ।

ঃ যাবেন না।

ঃ কেন?

ঃ সেখানে নীলকোর্তারা রয়েছে।

ঃ কবে থেকে?

ঃ আজ তিন দিন হলো।

ঃ গোলাবাড়ী আর পল্লীর লোকেরা বাধা দেয় নাই?

ঃ না। তারা দরজা খুলে দিয়েছিলো বরং।

ঃ ওঃ।

বুড়ো গোলাবাড়ীর দিকে আঙুল বাড়িয়ে শুধালো ঃ গোলাবাড়ীর মাথায় কিছু দেখতে পাচ্ছেন?

ঃ কি যেন উড়ছে।

ঃ হাঁ।

ঃ একটা নিশান বলে মনে হয়।

ঃ ত্রিবর্ণ পতাকা।

মার্কুইস শুধালো ঃ বিপদ-সংকেত কি এখনো বাজছে?

ঃ হাঁ।

ঃ কেন?

ঃ আপনারি জন্যে।

ঃ কিন্তু আমি তো শুনতে পাচ্ছি না।

ঃ বাতাসে শব্দটা অন্য পথে ভেসে যাচ্ছে।

একটু থেমে লোকটি শুধালো ঃ পথে পথে বিজ্ঞাপন পড়েছে, দেখেছেন ?

ঃ হাঁ।

ঃ তারা আপনাকেই খুঁজছে। একদল সৈন্য পর্যন্ত এসে গেছে।

ঃ তাই নাকি। তাহলে তো দেখা করতে হয়।

মার্কুইস পা বাড়ালো।

তার হাত ধরে বুড়ো বললো ঃ যাবেন না সেখানে।

ঃ তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে চাও ?

ঃ আমার বাড়ীতে।

মার্কুইস তীক্ষ্ণ চোখে ভিখারীর দিকে তাকালো।

ঃ দেখুন মালিক, আমার ঘর ভালো নয়, কিন্তু নিরাপদ। আপনি চলুন। গোলাবাড়ীতে গেলে ওরা আপনাকে গুলি করবে। আমার ঘরে তবু ঘুমাতে পারবেন। কাল সকালে নীল কোর্তারা এখান থেকে চলে যাবে। তখন আপনি যেখানে খুসি যাবেন।

মার্কুইস তবু প্রশ্ন করলো ঃ তুমি কোন্ দলে ? প্রজাতন্ত্রী না রাজতন্ত্রী ?

ঃ আমি ভিখারী।

ঃ কোন দলেই নয় ?

: দলাদলি আমি বিশ্বাস করি না।

: তুমি রাজার স্বপক্ষে না বিপক্ষে?

: ও নিয়ে মাথা ঘামাবার আমার সময় নাই।

: অথচ তুমি আমাকে সাহায্য করতে এসেছ?

: হাঁ।

: কেন?

: কারন আপনি আমার চেয়েও গরীব। আমার বাঁচবার অধিকার আছে, আপনার তাও নাই।

: তাই তুমি আমাকে বাঁচাতে চাও?

: নিশ্চয়। আমরা যে স্বগোত্র। আমি ভিক্ষা করি রুটি, আপনি ভিক্ষা করেন প্রাণ। আমরা দুজনেই ভিখারী।

: তুমি কি জানো—আমার মাথার দাম ষাট হাজার ফ্রাঁ?

: জানি বলেই তো আপনাকে লুকিয়ে রাখতে চাই সকল চোখের বাইরে। আসুন মঁসিয়ে, আর দেরী করবেন না।

দুজনে পথে নামলো।

অদ্ভুত বাড়ী।

একটা বুড়ো ওক গাছের শিঁকড় খুঁড়ে তার নিচে তৈরী হয়েছে ঘর। উপরে লতায়-পাতায় ঢাকা। নিচু, আঁধার, দৃষ্টির অগোচর।

হামাগুড়ি দিয়ে দুজনে ঘরে ঢুকলো।

ঘরে আলো নাই। চাঁদের আলো পড়েছে বাঁকা হয়ে।

কোনরকমে সামান্য কিছু খেয়ে তারা শুয়ে পড়লো।

মার্কুইস শুধালো : তোমার নাম কি ?

: তেলমার্স। তবে সবাই ডাকে ক্যামাঁ বলে।

: বুঝেছি। ক্যামাঁ এ-অঞ্চলের চলিত কথা।

: এর অর্থ ভিখারী। অনেকে আমাকে বুড়ো বলেও ডাকে। এই চল্লিশ বছর লোকে আমাকে বুড়ো বলে আসছে।

: চল্লিশ বছর ? বলো কি ? তখন তো তুমি যুবক ছিলে।

: যুবক আমি কোনদিনই ছিলাম না। যৌবন তো আপনাদের জন্যে। আপনারা মালিক—বড়লোক। আপনার পায়ে আজো বিশ বছরের যুবার শক্তি ; এই উঁচু বালিয়াড়িতে আপনি উঠে যান অনায়াসে। আর আমার পক্ষে হাটাই কষ্টকর। অথচ আমরা সমবয়সী। ধনীদের একটা মস্ত সুবিধা এই যে, তারা রোজ খেতে পায়। খাদ্যই তো জীবন।

একটু থেমে ভিখারী আবার সুরু করলো : ধনী আর দরিদ্র—এই খানেই তো যতো তফাত্—গোলমালের সূত্রপাত। অন্তত আমার তো তাই মনে হয়। দারিদ্ররা ধনী হতে চায় ; ধনীরা কিন্তু গরীব হতে রাজী নয়। তলিয়ে দেখতে গেলে এইটেই তো আসল কথা।

মার্কুইস হঠাত জিজ্ঞাসা করলো : আচ্ছা, তুমি কি আমাকে আগে থেকেই চিনতে ?

: নিশ্চয়। শেষবারের মতো আপনাকে দেখি দুবছর আগে। আপনি তখন ইংলণ্ডের পথে।

: অথচ আমি তোমাকে চিনি না।

: আপনি আমাকে দেখেছেন অনেকবার, কিন্তু চোখ মেলে

তাকান নি। তাকিয়েছি আমি। এখানেই তো মজা। দাতা আর গ্রহীতা এক চোখে চায় না।

: তাহলে এর আগেও তোমার সাথে আমার মুখোমুখি হয়েছে ?

: বহু বার। আমি যে ভিখারী। আপনার দুর্গে যাবার পথের ধারেই যে আমি হাত পেতে বসে থাকতাম। আপনার দান কতো বার আমাকে মরণের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। এমন অনেক সময় আসে যখন একটি পেনিও জীবন বাঁচায়। আপনি এক সময় আমার জীবন রক্ষা করেছেন, আজ আমি সে-ঋণ শোধ করলাম।

: সে কথা ঠিক। তুমিই আমাকে বাঁচিয়েছ।

: নিশ্চয়। কিন্তু এক সর্তে—

: কি ?

: এখানে কোন ক্ষতি আপনি করবেন না।

: আমি এসেছি এখানকার কল্যাণের জন্যে।

: সুখী হলাম। এইবার ঘুমুন।

আগে-পরে দুজনেই ঘুমিয়ে পড়লো।

ঘুম ভাঙলো তেলমার্সের ডাকে : মঁসিয়ে, তানিসের ঘণ্টা-ঘরে এইমাত্র চারটা বাজলো। বাতাসের গতি ফিরেছে, অথচ কোন শব্দ কানে আসছে না। নিশ্চয় বিপদ-সংকেত থেমে গেছে। হার্বে-অঁ-পাইল এখন নিরব—শান্ত। নীলকোর্তারা হয় ঘুমিয়েছে, না হয় চলে গেছে। আমারো ভিক্ষায় বেরুবার

সময় হলো। আপনিও এই বেলা এখান থেকে সরে পড়ুন।

তারপর দুই দিকে দুই হাত বাড়িয়ে বললো: আমি যাবো এই পথে। আপনি যান এই পথে।

মার্কুইসকে অভিবাদন করে ভিখারী চলে গেলো।

বিপরীত পথ ধরে মার্কুইসও থামলো এসে তে-মাথার মোড়ে।

প্রস্তর-ফলকের গায়ে কাগজের বিজ্ঞাপনটা সূর্যকিরণে চিক চিক করছে।

এগিয়ে যেয়ে সে পড়তে লাগলো। 'প্রিউর দ্য লা মান' স্বাক্ষরের নিচে আরো কয়েকটি লাইন লেখা রয়েছে ছোট অক্ষরে:

> 'ভূতপূর্ব মার্কুইস দ্য লাঁতিনাককে সনাক্ত করা হইলেই তৎক্ষণাত তাঁহাকে গুলি করা হইবে।
>
> স্বাক্ষর: অনুসন্ধান-বাহিনীর অধিনায়ক গোভাঁ।'

গোভাঁ!—সবিস্ময়ে উচ্চারণ করলো মার্কুইস। গভীর চিন্তায় সে স্তব্ধ। অজ্ঞাতেই তাঁর মুখ হতে আবার বের হলো: গোভাঁ!

কয়েক পা এগিয়ে আবার সে ফিরে এলো। আবার পড়লো বিজ্ঞাপনটি। আবার বললো আপন মনে: গোভাঁ!

ধীরে ধীরে সে এগিয়ে চললো। মুখে একটি মাত্র শব্দের অস্ফুট গুঞ্জন: গোভাঁ!

ও কিসের শব্দ ?

লাঁতিনাকের চমক ভাঙলো।

উন্মত্ত চীৎকার···মুহুর্মুহু গুলির শব্দ···তাল পাকিয়ে উঠছে কালো ধোঁয়া···আগুনের লেলিহান শিখা···

হার্বে-অঁ--পাইলে যুদ্ধ সুরু হয়েছে।

তীব্র কৌতুহলে লাঁতিনাক পার্শ্ববর্তী বালিয়াড়ির মাথায় গিয়ে দাঁড়ালো। আশে পাশের সব কিছু সেখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায়।

সত্যি বেধেছে যুদ্ধ। আক্রমণ আর অগ্নিকাণ্ড। আর্তনাদ আর অগ্নিশিখা।

কিন্তু আক্রমণ করেছে কারা ? কাদের সংগে এই লড়াই ?

হঠাত থেমে গেলো বন্দুকের শব্দ। ভেরী বাজছে শুধু তীব্র নিনাদে। বাজছে আর এগিয়ে আসছে।

ঝোপে-জংগলে কাকে যেন তারা খুঁজছে। কাকে ?

বাজনা ক্রমশ এগিয়ে আসছে। তার সাথে বহুকণ্ঠের কোলাহল। আর সেই কোলাহলকে ছাপিয়ে শত শত স্পষ্ট কণ্ঠে ধ্বনিত হলো একটি মাত্র নাম :

লাঁতিনাক! লাঁতিনাক! মার্কুইস দ্য লাঁতিনাক!

সংগে সংগে বালিয়াড়ির চারদিক ঘিরে ফেললো শত শত সৈনিক। স্পষ্ট করে তাদের কাউকে দেখা যায় না। ঝোপ-জংগল, লতা-পাতার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় সংগীন, কৃপাণ আর একটি ত্রিবর্ণ নিশান। দেখা যায় জোড়া জোড়া জ্বলন্ত চোখ।

শত শত উদ্যত সংগীন ও বন্দুকের লক্ষ্যস্থলে দাঁড়িয়ে মার্কুইস একা—একেবারে একা।

তবু সে নির্ভয়—বেপরোয়া।

কঠিন কণ্ঠে সে বলে উঠলো: আমাকেই তোমরা খুঁজছ। আমিই মার্কুইস দ্য লাঁতিনাক, ভাইকাউন্ট দ্য ফঁতিনা, রাজার সহকারী সেনাপতি। এই মুহূর্তে কায শেষ করো। বন্দুক তোলো। করো গুলি।

এক টানে ছাগলের চামড়ার ভেস্টটা ছিঁড়ে ফেলে খোলা বুক ফুলিয়ে সে দাঁড়ালো দর্পিত ভংগীতে।

কিন্তু কোথায় বন্দুক? কোথায় গুলি?

সমবেত শতকণ্ঠে উঠলো আনন্দ-উল্লাস: লাঁতিনাক দীর্ঘজীবী হোক! মঁসিয়ে দীর্ঘজীবী হোক! সেনাপতি দীর্ঘজীবী হোক!

নাটকের যেন পট-পরিবর্তন হলো।

মার্কুইসের চারদিকে ভাঁদির বীর সৈন্যদল। সম্ভ্রমে আভূমি নত।

সামরিক পোষাকে সজ্জিত একটি যুবক ভীড় ঠেলে এগিয়ে এলো। হাতের খোলা তলোয়ার মার্কুইসের হাতে দিয়ে বললো: আপনাকেই আমরা খুঁজেছি—পেয়েছি। এখন হতে আপনি সেনাপতি, সবাই আমরা সৈনিক। আদেশ করুন।

যুবকের ইংগিতে জনকয়েক সৈনিক এগিয়ে এলো। তাদের হাতে একটি ত্রিবর্ণ পতাকা।

যুবক বললো : মঁসিয়ে, আমার নাম গাভার্দ। হার্বে-অঁ-পাইলে নীলকোর্তাদের কাছ থেকে একমাত্র এই নিশান আমরা কেড়ে এনেছি।

: বেশ করেছ।—হাতের তরবারি মাথার উপর ঘুরিয়ে মার্কুইস চীৎকার করে উঠলো : দাঁড়াও সব। বলো—রাজা দীর্ঘজীবী হোক!

সারা বনভূমি কাঁপিয়ে উঠলো বিচিত্র জয়ধ্বনি : রাজা দীর্ঘজীবী হোক! মার্কুইস দীর্ঘজীবী হোক! লাঁতিনাক দীর্ঘজীবী হোক!

গাভার্দকে জিজ্ঞাসা করলো মার্কুইস : সংখ্যায় তোমরা কতো?

: আজ সাত হাজার। কালই হবে পনের হাজার।

: হার্বে-অঁ-পাইলের গোলাবাড়ীতে তোমরা নীলকোর্তাদের আক্রমণ করেছিলে?

: নীলকোর্তারা বাতাসের জন্যে সারা রাত আমাদের বিপদ-সংকেত শুনতেও পায় নি। আরামে তারা ঘুমুচ্ছিলো। ভোরেই আমরা গোলাবাড়ী ঘিরে ফেলি। অতি সহজেই কায শেষ হয়েছে। দেখুন মঁসিয়ে, আমার একটি ঘোড়া আছে। যদি আপনার কাযে লাগে—

: নিয়ে এসো।

সাদা ধপধপে ঘোড়াটি। সামরিক সাজে সজ্জিত। মার্কুইস ঘোড়ায় সওয়ার হলো একলাফে।

সমবেত জনতা চীৎকার করে উঠলো।

সামরিক কায়দায় স্যালুট করে গাভার্দ জিজ্ঞাসা করলো : মঁসিয়ে, কোথায় হবে আপনার প্রধান ঘাঁটি ?

: প্রথমে ফুজারে অরণ্যে। এই মুহূর্তে সকলে রওনা হও।

: তাই হবে। আর কি আদেশ আপনার ?

: তুমি বললে না, হাবে-অঁ-পাইলের অধিবাসীরা নীল-কোর্তাদের আশ্রয় দিয়েছিলো ?

: আজ্ঞে হাঁ।

: তাদের ঘরে আগুন দিয়েছ ?

: হাঁ। নীলকোর্তারা বাধা দিয়েছিলো। কিন্তু তারা দেড় শো, আর আমরা সাত হাজার। অনেক মরেছে।

: বেশ হয়েছে।

: আহতদের ব্যবস্থা কি হবে ?

: সাবার করে দাও।

: বন্দীদের ?

: গুলি করো।

: প্রায় আশি জন বন্দী।

: সব একসংগে গুলি করো।

: দুটি স্ত্রীলোক আছে।

: গুলি করো।

: তিনটি শিশু ?

: তাদের নিয়ে চলো। যা হয় পরে ঠিক করা যাবে।

মার্কুইস ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো।

* * *

ভিখারী তেলমার্স আপন মনে পথ চলেছে।

এমন সময় তার চোখে পড়লো—কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে। ব্যাপার কি? তেলমার্স দ্রুত পায়ে ধোঁয়া লক্ষ্য করে ছুটতে লাগলো।

একটা পাহাড়ে সে উঠলো অতি কষ্টে।

গ্রাম বা গোলাবাড়ীর চিহ্ন মাত্র নাই। হার্বে-অঁ-পাইলের ধ্বংস-স্তূপের বুকে তখনো জ্বলছে লেলিহান অগ্নিশিখা।

তেলমার্সের চোখে জল এলো। প্রাসাদ যখন পুড়ে যায়, তাও সয়। কিন্তু কুঁড়ে ঘর যখন আগুনে পোড়ে, তার চেয়ে শোচনীয় বুঝি আর কিছু নাই। এ যে মরার উপর খাঁড়ার ঘা···মাটির কীটের উপর নির্মম শকুনির নখরাঘাত!

কাঁপতে কাঁপতে সে নেমে এলো।

গোলাবাড়ীর দরজার কাছে এসে থামলো।

উঠানের মাঝখানে একটা কালো স্তূপ। মৃত মানুষের স্তূপ। চারদিকে রক্তের ঢেউ।

হায় নিরীহ গ্রামবাসী! হায় বিপ্লবী সৈনিকদল!

একটা আধ ভাঙা দেয়ালের পাশে তেলমার্সের চোখ পড়লো। চারখানি পা।

সে এগিয়ে গেলো।

দুটি স্ত্রীলোক পড়ে আছে।

একজনের পরনে ইউনিফর্ম—স্বেচ্ছাসেবিকা বুঝি। তার মাথায় চারটি গুলির চিহ্ন! অপরটি জনৈকা চাষী। শরীর

এখনো একেবারে ঠাণ্ডা হয় নাই। বুকে ক্ষীণ স্পন্দনের আভাষ। মরে নাই। অজ্ঞান হয়ে আছে।

তেলমার্স চেঁচিয়ে ডাকলো : কেউ কি এখানে আছ ?

: আমি আছি ক্যামাঁ।

: আমিও আছি।

গর্তের ভিতর থেকে দুজন চাষা বেরিয়ে এলো।

এক জন শুধালো : বেঁচে আছে কি ?

তেলমার্স ঘাড় নাড়লো। কোন কথা বলতে পারলো না।

চাষী দুজন কথা পাড়লো।

: উঃ, সবাইকে মেরে ফেললো গো।

: সব পুড়িয়ে দিলো।

: হা ঈশ্বর, এমনি করেই কি দিন চলবে ?

: ওই লম্বা বুড়ো লোকটাই তো আদেশ দিয়ে গেলো। বললো—মারো। পোড়াও। কাউকে রেহাই দিও না।

: তিনি আবার মার্কুইস।

: কি নাম রে ?

: লাঁতিনাক।

আকাশে মুখ তুলে তেলমার্স বললো আপন মনে : আগে যদি জানতাম—

—পাঁচ—

১৭৯৩।

জুলাই মাস।

সূর্য ডোবে ডোবে।

ক্রয়-ব্রাঁকার্দ হোটেলের সামনে এসে ঘোড়া থামালো এক অশ্বারোহী।

গায়ে ভারী আলখাল্লা। মাথায় চওড়া টুপি, তিন-রঙা চিহ্ন আঁকা। কটিদেশে বেল্টের সাথে দুটো পিস্তল। তার নিচে ঝুলছে কোষবদ্ধ তরবারি।

দরজা খুলে হোটেলওয়ালা শুধালো: আপনি কি এখানে থাকবেন?

: না। আমার ঘোড়াটার কিছু দানাপানির ব্যবস্থা করে দাও।

ঘোড়ার খাবার ব্যবস্থা করে দিয়ে হোটেলওয়ালা প্রশ্ন করলো: আপনি কোথায় যাবেন?

: দোলে?

: তাহলে ফিরে যান।

: কেন?

: দোলে এখন লড়াই হচ্ছে।

: ওঃ।

: কোত্থেকে আসছেন আপনি?

: পারি।

: একা ?

: সংগী আছে।

: কোথায় ?

: এই তরবারি আর পিস্তল।

অশ্বারোহীকে আপদমস্তক লক্ষ্য করে হোটেলওয়ালা মনে মনে বললো : কিন্তু দেখে তো একে পুরোহিত বলেই মনে হয়।

বাইরে বললো : দেখুন, আজ রাতের মতো আপনি এখানেই বিশ্রাম করুন। আপনি পথশ্রান্ত। আপনার ঘোড়াটাও ক্লান্ত।

: ঘোড়ার ক্লান্ত হবার অধিকার আছে; মানুষের নাই। হাঁ, তুমি বলছিলে না দোলে লড়াই হচ্ছে ?

: আজ্ঞে হাঁ।

: কারা লড়াই করছে ?

: সে-এক মজার ব্যাপার। কাকার সংগে ভাই-পোর লড়াই।

: মানে ?

: একজন ভূতপূর্ব লর্ড নিয়েছে প্রজাতন্ত্রের পক্ষ। আরেক ভূতপূর্ব লর্ড নিয়েছে রাজার পক্ষ। একজন যুবক, অপর বৃদ্ধ ; কাকা রাজভক্ত, আর ভাই-পো দেশভক্ত। কাকা সাদা কোর্তাদলের অধিনায়ক ; ভাইপো নীল কর্তাদলের সেনাপতি কেউ কমতি যায় না। মরণ পর্যন্ত তারা লড়বে।

ঃ মরণ পর্যন্ত ?

ঃ হাঁগো মঁসিয়ে। এই দেখুন না, খুড়ো-ভাই-পোর কেমন ভাব।

হাতের লণ্ঠনটা উঁচু করে হোটেলওয়ালা দরজার গায়ে পাশাপাশি লাগানো দুখানা বিজ্ঞাপনের দিকে আঙুল বাড়ালো। লেখাগুলো বড় বড়। অশ্বারোহী বুড়ো হলেও তার পড়তে কোন কষ্ট হলো না।

প্রথম বিজ্ঞাপন ঃ

> 'মার্কুইস দ্য লাঁতিনাক তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ভাইকাউণ্ট গোভাঁকে জানাইতেছেন যে, ভাইকাউণ্টকে ধরিতে পারিলেই তাহাকে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করার ব্যবস্থা করা হইবে।

দ্বিতীয় বিজ্ঞাপন ঃ

> 'গোভাঁ লাঁতিনাককে সতর্ক করিয়া দিতেছেন যে, তাঁহাকে ধরিতে পারিলেই গুলি করা হইবে।'

অশ্বারোহী টুপি খুলে দ্বিতীয় বিজ্ঞাপনখানাকে অভিবাদন করলো। তারপর বললো ঃ আচ্ছা, কোন্ পক্ষ জিতবে বলে তোমার মনে হয় ?

ঃ সে-কথা বলা শক্ত। তবে ভাইকাউণ্টের পাল্লাই ভারী বলে মনে হয়। আসল ব্যাপার কি জানেন ? দুজনই এতদঞ্চলের মালিক গোভাঁ পরিবারের বংশধর। একটি শাখার বর্তমান মাতব্বর হলেন মার্কুইস দ্য লাঁতিনাক ; অপর শাখার মাতব্বর ভাইকাউণ্ট গোভাঁ। অথচ দুজনে আজ কামড়া-কামড়ি

করে মরছে। নগর আর সহরের লোকেরা চায় বিপ্লব, তারা গোভাঁর পক্ষে। পল্লী অঞ্চলে লাঁতিনাকই সর্বেসর্বা। চাষীরা তো তাকে রাজা বলেই জানে। ফ্রান্সে পা দেওয়া মাত্রই আট হাজার লোক তাঁর সাথে যোগ দেয়। তার উপর আছে ইংলণ্ডের সাহায্য। সাগরের তীরভূমি দখল করতে পারলে তো ইংরেজরা এতো দিন নেমে পড়তো ফ্রান্সে। কিন্তু গোভাঁও সেয়ানা কম নয়। উপকূলটা সে হাতের মধ্যে নিয়ে বসে আছে।

একটু থেমে হোটেলওয়ালা আবার বলতে লাগলো: এদিকে আবার আর এক কাণ্ড ঘটেছে। লাঁতিনাক যেদিন এলেন, অনেক বন্দীকে সেদিন হত্যা করা হয়। দুটি মেয়ে-মানুষকেও তারা গুলি করে। তাদের একজনের ছিলো তিনটি শিশু সন্তান। তাদেরও ওরা সংগে করে নিয়ে পালায়। ছেলেমেয়ে তিনটি যে এখন কোথায় আছে কেউ জানে না। এদিকে প্যারি-বাহিনীর 'বনেট রুজ' নামে একটি দুর্ধর্ষ সেনাদল ওই ছেলেমেয়ে তিনটিকে নিয়েছিলো পোষ্য। এ-ব্যাপারে তারা তো ক্ষেপে উঠেছে। স্ত্রীলোকদের হত্যার প্রতিশোধ তারা নেবেই। পোষ্যদের তাদের চাইই। এখানেই বেঁধেছে যতো গেরো।

অশ্বারোহী শুধালো: দোলে যেতে কতো ক্ষণ লাগবে?

: প্রায় তিন ঘণ্টা। কিন্তু না যাওয়াই আপনার ভালো ছিলো।

: না যেয়ে আমার উপায় নাই।

: অতি প্রিয় জন কেউ কি সেখানে আছে ?

: হাঁ।

: আপনার ছেলে কি—

: তাও বলতে পারো।

হোটেলের পাওনা মিটিয়ে অশ্বারোহী ঘোড়ায় চাপলো।

দোল সহর।

সহর বললে ভুল হয়—একটা রাজপথ। পুরানো কালের পথ। রাস্তার কোল ঘেঁসে বড় বড় বাড়ী। দুই দিক থেকে বেরিয়ে গেছে অসংখ্য গলি। রাস্তার ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় পুরানো বাজার।

ক্রয়-ব্রাঁকাদের হোটেলওয়ালা ঠিকই বলেছে। ঘোরতর লড়াই চলেছে দোল সহরের বুকে।

সকালে এসেছে সাদাকোর্তা বাহিনী। রাতের অন্ধকারে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো নীলকোর্তাদল। সাদাকোর্তারা সংখ্যায় ছ হাজার: আর নীলকোর্তারা মাত্র পনেরো শো। তবু তারাই প্রথম আক্রমণ করলো। যুদ্ধ সুরু হলো।

অতর্কিত আক্রমণে সাদাকোর্তা দল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। মৃতের স্তূপ জমে উঠলো পথের দুই পাশে।

মার্কুইস দ্য লাঁতিনাকের সহকারী ইমানু ছুটে এলো। বললো: মঁসিয়ে আমরা অতর্কিতে আক্রান্ত।

: যতো শীঘ্র পারো ব্যারিকেড তৈরী করো। আর সেই ব্যারিকেডের আড়াল থেকে কামান দাগো।

: মঁসিয়ে, অকেজো মালপত্র ও স্ত্রীলোকদের আমি ইতিমধ্যেই ফুজারেতে পাঠিয়ে দিয়েছি। কিন্তু সেই তিনটি শিশু-বন্দীর কি করা হবে ?

: তারা আমাদের জামিন। তাদের পাঠিয়ে দাও লা তুর্গ্ দ্যুর্গে।

কথা শেষ করেই মার্কুইস ব্যারিকেডের দিকে ছুটে গেলো।

ব্যারিকেড প্রায় সম্পূর্ণ। দুই ছিদ্র পথে বসানো হয়েছে ষোল পাউণ্ডের দুটি কামান। একটির উপর ঝুঁকে পড়লো মার্কুইস্ স্বয়ং।

সুরু হলো অবিরাম তোপধ্বনি। হাতাহাতি সংঘর্ষের শেষ অধ্যায়।

ছিদ্রপথে গোভাঁকে লক্ষ্য করে মার্কুইস তিনবার তোপ দাগলো পরপর। তিনবারই তাঁর লক্ষ্য ভ্রষ্ট হলো।

এদিকে প্রমাদ গুনলো গোভাঁ।

দুটি মৃত্যুগর্ভ কামানের সামনে তার মুষ্টিমেয় সৈন্য কতোক্ষণ টিকবে ? অবশিষ্ট সমস্ত সৈন্য নিয়ে একযোগে কি সে ঝাঁপিয়ে পড়বে ব্যারিকেডের উপর ?

কিন্তু বার শো সৈন্য কি পাঁচ হাজার সৈন্যকে হটিয়ে দিতে পারে ?

তবে কি সে অপেক্ষাই করবে ? তাতেও তো ধ্বংস অনিবার্য। উপায় ?

বিদ্যুতের মতো একটা সমর-কৌশল খেলে গেলো গোভাঁর মাথায়।

এ সহর তাঁর অত্যন্ত পরিচিত। সে জানে, পুরানো বাজারের যেখানটায় ভাঁদির সৈন্যরা ব্যারিকেড বানিয়ে আত্মরক্ষা করে আছে, তারি ঠিক পিছনে আছে সংকীর্ণ আঁকাবাঁকা গলির একটা গোলকধাঁধা।

সহকারী ক্যাপ্টেন গেসাকে কাছে ডেকে গোভাঁ বললো: সম্মুখ-বাহিনীর ভার রইলো তোমার উপরে। প্রাণপণ শক্তিতে তোপ দাগো। শত্রুপক্ষ যেন মুহূর্ত মাত্র বিশ্রাম না পায়।

গেসা ঘাড় নাড়লো।

গোভাঁ শুধালো: আমাদের ভেরীবাদকরা সব প্রস্তুত ?

: আজ্ঞে হ্যাঁ।

: ন'জন ভেরীবাদকের দু'জন তুমি রাখো। সাত জন চলুক আমার সাথে।

আতংকিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো গেসা: কোথায় ?

তার কানে কানে কি যেন বলে গোভাঁ ডাকলো: বনেট রুজ্।

সার্জেণ্ট রাদুব সহ বারো জন সৈন্য এসে দাঁড়ালো।

গোভাঁ বললো: সমস্ত সৈন্যদল আমি চাই।

: উপস্থিত।—বললো রাদুব।

: বারো জন মাত্র ?

: আমরা বারো জনই বেঁচে আছি।

: যথেষ্ট। সার্জেণ্ট, তোমার সৈন্যদের আদেশ করো—

খড়ের দড়ি পাকিয়ে যার যার বন্দুক জড়িয়ে নিক ভালো করে : যেন ঠোকাঠুকি লাগলেও কোন শব্দ না হতে পারে।

অন্ধকারে কায চললো নিঃশব্দে।

গোভাঁ আদেশ দিলো ঃ সৈন্যগণ, জুতা খোলো।

ঃ জুতা আমাদের নাই।—উত্তর দিলো সার্জেণ্ট।

সজ্জিত হলো বাহিনী। বারো জন সৈন্য আর সাত জন ভেরীবাদক।

গোভাঁ যোগ করলো বিংশতিতম প্রাণ। চেঁচিয়ে বললো : একজন করে দাঁড়াও সার বেঁধে। আমার পরেই ভেরীবাদক। তারপরে সৈন্যদল। পা ফেলো। চলো এগিয়ে।

অন্ধকারে এগিয়ে চললো কুড়িটি ছায়া মূর্তি—কুড়িটি প্রাণ। দুই পাশে অবিরাম গোলাবর্ষণ। ঘরে ঘরে দ্বার রুদ্ধ : বাতায়ন দীপহীন। সারা সহর স্তব্ধ—মৃত।

বিশ মিনিট নিঃশব্দ অভিযান।

গোভাঁর অগ্রগতি অভ্রান্ত।

গলি শেষ হয়েছে। সামনে পুরানো বাজার। পথ খোলা। বাধা দেবার কেউ নাই।

উনিশ জন সংগী সহ সশস্ত্র গোভাঁ। সম্মুখে পাঁচ হাজার ভাঁদি-বীর। কিন্তু তাদের মুখ দেখা যায় না—দেখা যাচ্ছে পিঠ।

বারো জোড়া হাতে বারোটি বন্দুক উদ্যত।

সাত জোড়া হাতে ভেরী বাজাবার কাটি।

গোভাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হলো রণ-নির্দেশ : গুলি চালাও। সংগীন উঁচু করো। ঝাঁপিয়ে পড়ো শত্রুর বুকে।

সম্মুখে কামানের মুখে অবিরাম অগ্নিবর্ষণ। পিছনে বন্দুকের মৃত্যু-গর্জন। দুই আগুনের মাঝে শত্রুসৈন্য দিশেহারা।

পলায়ন। আত্মসমর্পন। পরাজয়।

বিপ্লবী দল উল্লাসে আত্মহারা। গোভাঁ নীরব অচঞ্চল।

সহসা তার চোখে পড়লো—সেই হট্টগোল আর ধ্বংস-স্তূপের ভিতর দিয়ে টলতে টলতে এগিয়ে আসছে একটা লোক। তার এক হাতে পিস্তল, অন্য হাতে খোলা তলোয়ার। সর্বাংগে ক্ষত-চিহ্ন। রক্তাপ্লুত দেহ।

গোভাঁ এগিয়ে গেলো : আত্মসমর্পন করো।

লোকটা চাইলো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে।

গোভাঁ বললো : তুমি আমার বন্দী।

লোকটি নিরুত্তর।

: তোমার নাম কি ?

: ছায়া-নর্ত্তক বলে সবাই আমাকে ডাকে।

: সত্যি তুমি বীর। —বলে গোভাঁ হাত বাড়ালো।

লোকটি অকস্মাত চীতকার করে উঠলো : রাজা দীর্ঘজীবী হোক।

—বলেই যথাশক্তিতে দুই হাত এক সংগে তুলে ধরলো। এক হাতে পিস্তল ছুড়লো গোভাঁর বুক লক্ষ্য করে। আরেক হাতে তরবারি হানলো গোভাঁর মাথায়।

বিদ্যুত গতিতে ঘটলো এই বিস্ময়কর ব্যাপার। কিন্তু বিদ্যুততর গতিতে ছুটে এলো এক অশ্বারোহী। দাঁড়ালো দু'য়ের মাঝখানে। গোভাঁর প্রাণরক্ষা হলো।

পিস্তলের গুলিতে ঘোড়াটা মরলো।

অশ্বারোহীর মুখে লাগলো তরবারির আঘাত। রাস্তার পাথরে লুটিয়ে পড়ে সে জ্ঞান হারালো।

গোভা হাঁটু গেড়ে বসলো তার পাশে : কে এই মহাপ্রাণ ?

তার সারা মুখ লালে লাল। চিনবার উপায় নাই। শুধু দেখা গেল সাদা চুল। গায়ে আলখেল্লা। মাথায় তিন-রঙা চিহ্ন। কোমরে পিস্তল ও তরবারি।

: এখানে কেউ কি একে চেনো না ?—প্রশ্ন করলো গোভাঁ।

সবাই নীরব।

: দেখো তো এর পকেটে কোন কাগজপত্র আছে কিনা ?

একজন ডাক্তার আহত ব্যক্তির ক্ষত স্থান ধুইয়ে দিচ্ছিল। সেই পকেটে হাত দিলো।

বের হলো একখানি চার-ভাঁজ করা কাগজ। তাতে লেখা : গণ-রক্ষা পরিষদ : নাগরিক সিমুর্দ্যা।

: সিমুর্দ্যা !—আর্তনাদ করে উঠলো গোভাঁ।

ঠিক সেই মুহূর্তে চোখ মেললো আহত বৃদ্ধ।

তাঁর পায়ের উপর পড়ে গোভাঁ কেঁদে ফেললো : আপনি ? মাষ্টার মশায় ?

: হ্যাঁ বাবা।—টেনে টেনে বললো সিমুর্দ্যা।

জন কয়েক সৈনিক এসে অভিবাদন করলো। তাদের সংগে একটি বুড়ো মানুষ। আহত, রক্তাক্ত দেহ।

সৈনিক বললো : সেনাপতি, এই লোকটি আপনাকে গুলি করেছিলো। সকলের অলক্ষ্যে গড়িয়ে গড়িয়ে একটা সেলারে ঢুকছিলো। আমারা দেখতে পেয়ে ধরে এনেছি।

তার দিকে চেয়ে গোর্ভা বললো : তুমি আহত।

: আমাকে গুলি করবার কোন অসুবিধা তাতে হবেনা। —লোকটি কঠিন কণ্ঠে উত্তর দিলো।

: লোকটাকে শুইয়ে দাও। ক্ষত স্থান বেঁধে দাও যত্ন করে। ওকে বাঁচিয়ে তোলো।

: আমি মরতে চাই।

: আমি চাই তোমাকে বাঁচাতে। রাজার নামে তুমি চেয়েছিলে আমাকে খুন করতে; প্রজাতন্ত্রের নামে আমি তোমায় ক্ষমা করলাম।

সিমুর্দাব কপালে কিসের যেন ছায়া পড়লো। হতাশ ভাবে সে বললো নিজের মনে : দয়ালু—বড়ো বেশী দয়ালু এই ছেলেটা।

—ছয়—

হাসপাতালের একটা ছোট ঘরে শুয়ে আছে সিমুর্দ্যা একা। চোখে তাঁর ঘুম নাই। আঘাতের যন্ত্রণা আর মিলনের আনন্দে সে আত্মহারা।

গোভাঁ ফিরে এসেছে তাঁর কাছে। এতোটুকু কিশোর এতো বড়ো হয়েছে। হয়েছে মহাবীর।

গোভাঁর মনের আকাশে অনেক স্বপ্নের রামধনু উঠলো ঝলমলিয়ে:

অনেক দিন আগেকার কথা:

সংসারে সর্বহারা একটি যুবক।

বাপ-মা মারা গেছে। স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নাই। বিষয়-সম্পত্তির বালাই নাই।

অগাধ পণ্ডিত। ইওরোপের সবগুলি ভাষা সে জানে। দিন রাত পড়াশুনা করে। চিন্তা করে অবিরাম। ধ্যানগম্ভীর।

অনেক ভেবে পুরোহিতের একক জীবন সে বেছে নিলো; কিন্তু তাতেও শান্তি মিললো না। ধর্মের নামে মিথ্যাচার আর পুরোহিতের চোখ-ধাঁধানো খোলস তাঁকে ব্যাকুল করে তুললো। সব ছেড়ে দিয়ে সে নেমে এলো পথে।

পরিবার হতে বঞ্চিত হয়ে সে ভালবাসলো দেশকে।

জীবন-সংগিনী ধরা দিলো না; তাই সে মনের রাখী বাঁধলো

মানবতার সাথে। বিশ্ব-মানব-সাম্যের স্বপ্ন ধরা দিলো তাঁর চোখে। প্লেটোর বাণী তাঁকে হাতছানি দিলো।

এমনি সময়ে এক রাজ-পরিবারে তাঁর ডাক পড়লো গৃহ-শিক্ষকের কাযে।

কিশোর ছাত্র। রাজবংশের উত্তরাধিকারী।

যুবকের বঞ্চিত জীবনের রুদ্ধ ভালোবাসার ঝর্ণা কিশোর ছাত্রকে কেন্দ্র করে উদ্বেলিত হয়ে উঠলো সহস্র ধারায়। সে হলো একাধারে তার শিক্ষাদাতা, পিতা, ভাই, বন্ধু—সব। এই কিশোর-চিত্তকে সে গড়ে তুলবে। মানুষ করবে। বিরাট পুরুষে রূপায়িত করবে।

ঘনিষ্ঠ জীবন যাপনে বন্ধন হলো ঘনিষ্ঠতর। কিশোর বাপ-মা-হারা। মানুষ করে এক অন্ধ ঠাকুরমা। সংসারের মালিক কাকা বিষয়-কর্মে ব্যস্ত। একা থাকে ভার্সাই সহরে। অতএব গৃহ-শিক্ষকের উপরেই পড়লো কিশোর-ছাত্রের সকল ভার।

শিক্ষক-ছাত্রের ব্যবধান ঘুচে গেলো ক্রমে।

বাঁধা হলো প্রাণের রাখী।

তারপর এলো অনিবার্য বিদায়ের দিন।

পাঠ সাংগ হলো। কিশোর হলো যুবক। ক্যাপ্টেনের পদ নিয়ে চলে গেলো কোন্ সুদূর সেনানিবাসে।

আর শিক্ষক? পাওনা-গণ্ডা চুকিয়ে নিয়ে সেও ফিরে এলো রিক্ত পৃথিবীতে। গীর্জার একতলা ঘরে পাতলো শূন্য আসন।

এলো বিপ্লবের কালো মেঘ।

ঝড় উঠলো আকাশ আচ্ছন্ন করে।

শিক্ষকের বেদনা-বিক্ষুব্ধ অন্তরে বেঁজে উঠলো স্বপ্ন-বাঁশরী : সেও ছুটে এলো পথে। বিপ্লব-পথিক।

অনেক সূর্যোদয় আর রাতের আঁধার পার হয়ে···বহু পথে পথে পদচিহ্ন এঁকে আর এক রক্তাক্ত কালো রাতে আবার দেখা হলো শিক্ষক ও ছাত্রে।···

হাসপাতালের রোগশয্যায় শুয়ে বৃদ্ধ সিমুর্দ্যা স্বপ্ন দেখছে বীর বিপ্লবী গোভাঁর মুখচ্ছবি।

বিচিত্র কালের গতি।·········

—সাত—

দেখতে দেখতে এলো অগাষ্ট মাস।

এই স্বল্প সময়ের মধ্যে ফরাসী ইতিহাসের অনেকগুলি পাতা লেখা হয়ে গেছে।

বিপ্লবের অন্যতম হোতা ম্যারাত্ প্রাণ দিয়েছে গুপ্ত-ঘাতকের অস্ত্রাঘাতে।

চার্লোতি কোর্দার মস্তক দ্বিখণ্ডিত হয়েছে।

এদিকে দোলের নৈশ-যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ের পর ভাঁদির সৈন্যদলের অবস্থা ক্রমাগত শোচনীয় হয়ে উঠেছে।

প্রকাশ্য রণক্ষেত্রে বার বার তাদের হার হয়েছে। প্রজা-তন্ত্রীদলের প্রতিষ্ঠা হয়েছে নিঃসন্দেহ। তাই এবার স্বুরু হয়েছে খণ্ড যুদ্ধ—বনে, জংগলে, দুর্গ-প্রাকারের অন্তরালে।

মার্ক্‌ইস্ দ্য লাঁতিনাক তাঁর দলবলসহ আশ্রয় নিয়েছে গোভাঁ-পরিবারের বাসভবন ফুজারের অন্তর্গত লা তুর্গ্ দুর্গে; আর ভাইকাউন্ট গোভাঁ সদলে অবরোধ করেছে সেই দুর্গ।

দুর্গের চারদিকে বিপ্লবী সেনাদল আস্তানা পেতেছে; শিবির পড়েছে পর পর। দুর্গের বাইরে যাবার পথ সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ।

ওদিকে গার্ন্‌সির দারিয়ায় নোঙর ফেলে অপেক্ষা করছে বৃটিশ নৌ-বহর। জেনারেল ক্রেগ তাদের অধিনায়ক। মার্ক্‌ইস্

দ্য ল'াতিনাকের একটি ইংগিতে তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে ফ্রান্সের মাটিতে।

কিন্তু কোন্ পথে যাবে সেই ইংগিত ?

মার্কুইস দ্য ল'াতিনাক লা তুর্গ্ দুর্গে অবরুদ্ধ। একটি পিঁপড়েরও দুর্গ হতে বের হবার পথ নাই। চতুর্দিকে বিপ্লবী বাহিনীর সতর্ক শ্যেন-দৃষ্টি।

লা তুর্গ্।

বিরাটকায় গোলাকার দুর্গ। একটা খাঁড়া পাহাড়ের চূড়া থেকে সোজা মাথা তুলেছে আকাশে।

আজ তার অতীত গৌরব বিলুপ্তপ্রায়। বহিঃপ্রাচীরে ফাটল ধরেছে। ভেঙে পড়েছে অনেক খিলান আর গম্বুজ। চুনকাম খসে খসে পড়ছে।

তবু লা তুর্গের দিকে চাইলে মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে ওঠে—যেন নেশা লাগে। সীমাহীন বিরাটত্ব আর অপরাজেয় শক্তির প্রতীক। বিধ্বস্ত হলেও ভয়াবহ!

রাতের আঁধার নেমেছে ফুজারে অরণ্যের বুকে। লা তুর্গ্ দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকারে ভীমকায় প্রেতের মতো। তার খোলা জানালা দিয়ে ঠিকরে আসছে আলো। প্রেত-দেহের সহস্র জ্বলন্ত চোখ যেন।

দুর্গের চূড়া থেকে অকস্মাত কর্কশ রবে শিঙা বেজে উঠলো। রাতের স্তব্ধতা খান খান হয়ে ভেঙে পড়লো।

দুর্গের নিচে থেকে উত্তর দিলো রণভেরীর শব্দ।

দুর্গ-চূড়া হতে আবার বেজে উঠলো শিঙা।

নিচ থেকে আবার উত্তর দিলো রণভেরী।

দুর্গ-চূড়ায় দেখা দিলো একটি ছায়া-মূর্তি। বাতাসে ভেসে এলো তার কণ্ঠস্বর : এইবার তাহলে আমার বক্তব্য স্বরু করি ?

অন্ধকার সেনা-শিবির হতে উত্তর এলো : স্বচ্ছন্দে।

: শোন তাহলে। মার্কুইস দ্য লাঁতিনাকের সহকারী আমি গুজ্-লে-ক্রুয়াঁ কথা বলছি। আমার আর এক নাম 'ব্রিস্-ব্লু', কারণ তোমাদের মতো নীলকোর্তাদের আমি যম। আমার আর এক নাম ইমান্নু, কারণ তোমাদের ধ্বংস করাই আমার এক মাত্র লক্ষ্য। গ্রেনভিলের যুদ্ধে আমার একটি আঙুল নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তোমাদেরি কারো তরবারির আঘাতে। লাভালে তোমরাই গিলোটিনে ফেলে হত্যা করেছ আমার বাবাকে, মাকে, আমার আঠারো বছরের বোন জ্যাকুলাইনকে।

সেই আমি কথা বলছি মার্কুইস গোভাঁ দ্য লাঁতিনাকের পক্ষ থেকে। তিনি আমার পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন। আমার মুখ দিয়ে তিনিই কথা বলছেন।

এই বার শোন আসল কথা। আমাদের হাতে তিনটি শিশু-বন্দী রয়েছে। তোমাদেরই কোন সেনাদল তাদের পোষ্য নিয়েছে। সুতরাং তারা তোমাদের লোক। সেই তিনটি শিশুকে আমরা তোমাদের হাতে ফিরিয়ে দিতে চাই।

কিন্তু এক সর্তে।

আমাদের স্বাধীন ভাবে এই দুর্গ ছেড়ে চলে যেতে দিতে হবে।

যদি তোমরা এই প্রস্তাবে রাজী না হও, তাহলে মাত্র দুটি পথে তোমরা এই দুর্গ আক্রমণ করতে পারবে। এক—বনের দিকটা; সেখানে বুরুজের খানিকটা দেয়াল ভাঙা আছে। আর—দুর্গ-প্রবেশের সেতু-পথে।

ওই সেতু-পথের উপরের দালানটি তিন-তলা। নিচের তলায় আমি নিজের হাতে সাজিয়ে রেখেছি ছয় পিপে আলকাতরা আর একশো বোঝা শুকনো কাঠ। সমস্ত দোতলাটা কাগজ পত্রে ভর্তি। আর তেতলায় বোঝাই রয়েছে খড়। সেতু-পথ আর মূল দুর্গের মাঝখানে আছে একটি দুর্ভেদ্য লৌহ-দ্বার। কামানের গোলাও সে দরজা ভাঙতে পারবে না কোন দিন। লৌহ-দ্বারের চাবি রয়েছে স্বয়ং মঁসিয়ের হাতে।

সেই লৌহ-দ্বারের নিচ দিয়ে আমি কাটিয়েছি একটি সরু গর্ত। সেই গর্ত-পথে বসিয়েছি একটি গন্ধকের কাটি। তার একদিক রয়েছে আলকাতরার পিপের সাথে যুক্ত, অপর দিক রয়েছে মূল দুর্গে আমার হাতের কাছে। ইচ্ছা করলেই যে-কোন মুহূর্তে আমি সেই গন্ধকের শলায় আগুন ধরিয়ে দিতে পারি।

দুর্গ-নিচের বন্ধুগণ, এখন ভেবে দেখো,—যদি তোমরা আমাদের বাইরে যেতে না দাও, তাহলে বন্দী শিশু তিনটিকে আমরা রেখে দেব সেতু-পথের উপরকার তিন-তলা দালানের

মাঝের তলায়। তার নিচের তলায় থাকবে আলকাতরার স্তূপ আর উপরের তলায় থাকবে খড়। গন্ধক-শলার একটা দিক থাকবে আমাদের হাতে। আর বহির্গমনের একমাত্র পথ ওই লৌহ-দ্বার আমরা দেব বন্ধ করে।

তারপরে—

তোমরা যদি সেতু-পথে আক্রমণ করো, ওই দালানে তোমরাই আগুন জ্বালাতে বাধ্য হবে। আর যদি পিছনের বুরুজের ভাঙা দেয়াল তোমরা আক্রমণ করো, তাহলে আমরা আগুন ধরাবো ওই দালানে। যদি তোমরা একযোগে দুই পথেই আক্রমণ করো, আমরা দুজনেই ওই দালানে আগুন জ্বালাবো এক সংগে। অর্থাত শিশু তিনটির ধ্বংস অনিবার্য।

এখন বলো,—আমাদের প্রস্তাবে তোমরা রাজী কি গররাজী।

যদি রাজী হও, আমরা বেরিয়ে যাবো এই দুর্গ থেকে।

যদি গররাজী হও, শিশু তিনটি মরবে।

ব্যস্। আমার বক্তব্য শেষ।

দুর্গ-চূড়া স্তব্ধ হলো।

নিচ থেকে ধ্বনিত হলো জবাব : আমরা গররাজী।

কর্কশ কঠিন স্পষ্ট কণ্ঠস্বর।

সংগে সংগে আর একটি কোমল কণ্ঠস্বর শোনা গেলো : বিনা সর্তে আত্মসমর্পনের জন্যে আরও চব্বিশ ঘণ্টা সময় তোমাদের দিলাম। আগামী কাল ঠিক এই সময়ের মধ্যে

যদি তোমরা আত্মসমর্পন না করো, তাহলে আমরা আক্রমণ চালাবো।

প্রথম কণ্ঠস্বর নিচ থেকে বললো আবার: আর সে আক্রমণ হবে নির্মম—নিষ্ঠুর।

দ্বিতীয় ছায়ামূর্তির আবির্ভাব হলো দুর্গ চূড়ায়। ম্লান চন্দ্রালোকে ফুটে উঠলো তাঁর মুখ: মার্ক্ইস দ্য লাঁতিনাক।

বিস্মিত কণ্ঠে সে বললো: একি? পুরোহিত আপনিও এই দলে?

নিচের কঠিন কণ্ঠস্বর জবাব দিলো: হাঁ দেশদ্রোহী, আমিও ঐ দলে।

নিচের কঠিন কণ্ঠস্বর বৃদ্ধ সিমুরদ্যাঁর।

আর কোমল কণ্ঠস্বরের মালিক তরুণ গোভাঁ।

শুধু কণ্ঠস্বরে নয়, দুজনের প্রকৃতি ও নীতিতেও এই তফাত্ অত্যন্ত স্পষ্ট। একজনের প্রকৃতি তীব্র, তীক্ষ্ণ, প্রত্যক্ষ; অপরের প্রকৃতি কোমল, কান্ত, মধুর। একজনের পথ হৃদয়হীন কর্তব্য; অপরের পথ প্রাণস্পর্শে সজীব। একজন সেনাপতি; অপর জন নাগরিক-প্রতিনিধি।

দুজনের মধ্যে ভালোবাসা গভীর। শিক্ষক ও ছাত্র। পিতা ও পুত্র।

কিন্তু দুয়ের মধ্যে নীতির পার্থক্য বুঝি বা গভীরতর। দুজনই ভাঁদি-বিদ্রোহ দমনে কৃত সংকল্প। দুজনই পথিক

বিপ্লব-পথের। কিন্তু ভিন্ন তাদের অস্ত্র। সিমুরদ্যাঁর হাতে ধ্বংসের বজ্র ; গোভাঁর লক্ষ্য বিজয়লাভ।

দুজনই সর্বশক্তিমান।

গণ-নিরপত্তা পরিষদের প্রতিনিধি সিমুরদ্যাঁ।

রোবেস্পিয়র, দাঁতন ও ম্যারাত্ স্বাক্ষরিত ক্ষমতা-নামা তাঁর হাতে।

দোল-বিজয়ী বীর গোভাঁ। সৈন্য-শক্তি তাঁর হাতে।

নীতির এই বিরোধ একদিন ফুটে বেরুলো ঘরোয়া আলোচনাকে কেন্দ্র করে :

সিমুরদ্যাঁ। জিজ্ঞাসা করলো : লাঁতিনাককে বন্দী করে কি করবে ?

: গুলি।—উত্তর দিলো গোভাঁ।

: না, তাকে গিলোটিন করতে হবে।

: আমি কিন্তু সামরিক মৃত্যুর পক্ষপাতী।

: আমি পক্ষপাতী বৈপ্লবিক মৃত্যুর।

পরক্ষণে গোভাঁর মুখের উপর চোখ রেখে সিমুরদাঁ শুধালো : সেণ্ট-মারি-লা-ব্লাঁ-র গীর্জার সন্ন্যাসিনীদের তুমি ছেড়ে দিলে কেন ?

: স্ত্রীলোকের বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ করি না।

: লুভাঁতে যাদের বন্দী করা হয়েছিলো সেই সব ধর্মান্ধ বুড়ো পুরুতদের কেন তুমি বিপ্লবী-বিচারশালায় পাঠাও নি ?

: বুড়ো মানুষের বিরুদ্ধেও আমি যদ্ধ করি না।

ঃ কিন্তু বুড়ো পুরুত যুবক পুরুতের চেয়েও মারাত্মক। সাদা চুল আর কুঁচকানো মুখের উপর মানুষের অটল বিশ্বাস। এতটা দয়ালু হয়ো না গোভাঁ। টেম্পল্ টাওয়ার-এর উপর কড়া নজর রেখো।

ঃ 'টেম্পল্ টাওয়ার!' ডফিনকে আমি কারাগার থেকে মুক্তি দেব। শিশুর বিরুদ্ধেও আমার যুদ্ধ নয়।

সিমুরদ্যার চোখের দৃষ্টি প্রখর হয়ে উঠলো। ঃ ছাখো গোভাঁ, স্ত্রীলোক যখন মারি-আঁতয়নেত্ হয়, বৃদ্ধ যখন হয় ষষ্ঠ পায়াস বা পোপ, আর শিশু যখন দেখা দেয় লুই কাপেত্-এর রূপে,—তখন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অবশ্য কর্তব্য।

ঃ আপনি আমার গুরু। আপনি তো জানেন, আমি রাজনীতিক নই।

ঃ তবে কি লাঁতিনাকে ক্ষমা করবে?

ঃ না।

ঃ কেন? তার বিরুদ্ধেও তোমার যুদ্ধ করা উচিত নয়। সে তোমার আত্মীয়।

ঃ ফ্রান্স আমার আত্মীয়তম।

ঃ লাঁতিনাক বৃদ্ধ।

ঃ লাঁতিনাক দেশত্যাগী। তাই তাঁর বেলায় কোন বয়সের বিচার নাই। লাঁতিনাক ডেকে এনেছে ইংরেজদের ফ্রান্সের মাটিতে। লাঁতিনাক আক্রমণের প্রতীক। লাঁতিনাক দেশের শত্রু। তাঁর আর আমার মধ্যে যে শত্রুতা, একজনের মৃত্যু ছাড়া তার অবসান হতে পারে না।

ঃ গোভাঁ, তুমি প্রতিজ্ঞা করছ?

ঃ হাঁ, করছি।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ। কি দেখছে দুজন দুজনের চোখে? কথা বললো গোভাঁ ঃ নর-রক্তে চিরকাল লাল হয়ে থাকবে এই দিনগুলি—রক্তরাঙা সতেরো শো তিরানব্বুই।

সিমুরদ্যাঁ সংগে সংগে বলে উঠলো ঃ খুব সাবধানে পা ফেলো গোভাঁ। পৃথিবীতে নির্মম কঠোর কর্তব্যও আছে। অকারণে কাউকে দোষী করো না। মহাবিপ্লবের দিনে আমাদের বাস। এই বিপ্লবের চরমতম শত্রু পুরানো পৃথিবী। দয়ার স্থান এখানে নাই। প্রাণঘাতী রোগের বিরুদ্ধে চিকিতসাবিদের যে সংগ্রাম, সেখানে দয়ার স্থান আছে কি? গ্যাংগ্রিনে অস্ত্রপ্রচার করতে সার্জন কি মায়া করে? বিপ্লব নির্মূল করে রাজার রাজশক্তি, অভিজাতের আভিজাত্য, সৈনিকের অত্যাচার, পুরোহিতের অন্ধ বিশ্বাস, বিচারকের বর্বরতা। এ কাষ ভয়ানক। বিপ্লব অকম্পিত হাতে তাই সমাধা করে। বিপ্লব ধরণী-দেহের গ্যাংগ্রিনে অস্ত্র চালায়। দূষিত অংশকে কেটে বাদ দেয়। তাই এতো রক্তপাত। আজকের দিন তাই রক্তরাঙা।

ধীর গলায় গোভাঁ বললো ঃ যে-সার্জন অস্ত্রপ্রচার করে তাকে দেখি ধীর, স্থির, প্রশান্ত। কিন্তু বিপ্লবের পুরোভাগে যাদের দেখছি, তারা অশান্ত, উচ্ছৃংখল।

সিমুরদ্যাঁ জবাব দিলো ঃ নির্মম কর্মীকেও বিপ্লবের প্রয়োজন। হাতিয়ার ধরতে যে-হাত কাঁপে বিপ্লব তাকে দূর

করে দেয়। দাঁতন ভয়ংকর। রোবেস্‌পিয়র অটল। ম্যারাত্‌ চির-রুষ্ট। তাঁদেরই আজ প্রয়োজন। সারা ইওরোপ তাঁদের দিকে চেয়ে আতংকে শিউরে উঠবে।

: হয়তো অনাগত ভবিষ্যতও সত্রাসে কাঁপবে এঁদের স্মরণ করে।

: বিপ্লবের মধ্যেই একদিন এই সন্ত্রাসবাদের অর্থ খুঁজে পাওয়া যাবে।

: কে জানে, হয়তো এই সন্ত্রাসবাদই কলংক-কালিমা এঁকে দেবে বিপ্লবের ললাটে।

একটু থেমে গোভাঁ বলতে লাগলো স্বপ্নাচ্ছন্ন কণ্ঠে: সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা! শান্তি ও মিলনের এই বাণীকে কেন আমরা মানুষের আতংকের কারণ করে তুলবো? আমরা চাই বিশ্ব-প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। ভয় দেখিয়ে কি এতো বড়ো কায হবে? জুজুবুড়ী দেখিয়ে কি মানুষের মনকে টানা যায়? যায় না। মন্দের পথে ভালোর আবির্ভাব হয় না। রাজার মৃত্যু হোক, কিন্তু বাঁচুক জাতি। মুকুট ভেঙে যাক, কিন্তু মাথা থাক উঁচু। বিপ্লব শান্তি, ভীতি নয়। মানব-সাহিত্যের সুন্দরতম কথাই তো মুক্তি। পরাজিতকে যদি ক্ষমা না করতে পারি, তাহলে জয়লাভের সার্থকতা কোথায়? সমর-ক্ষেত্রে আমরা শত্রুর শত্রু, কিন্তু জয়লাভের পরে আমরা তার ভাই।

সিমুরদ্যাঁ আবার বললো: খুব সাবধান গোভাঁ। তুমি আমার পুত্রাধিক প্রিয়। তাই বলছি—সাবধান। যে সংকট-

কালের ভিতর দিয়ে আমরা চলেছি, তাতে ক্ষমা অনেক সময় বিশ্বাসভংগেরই নামান্তর।

আড়াল হতে যদি কেউ এই ছুটি মানুষের আলোচনা শোনে তাহলে হয়তো কল্পনা করবে—কথা বল্‌ছে কুঠার আর তরবার।

* * * *

সেই সময়ে অপরিচিত পথ ধরে এগিয়ে চলেছে একটি ভিখারিণী।

ছিন্ন বাস। রুক্ষ কেশ। খালি পা ফেটে ঝরছে রক্তধারা।

রাত-দিন সে চলেছে। কখনো ভিক্ষা করে, কখনো ব' ফলমূল খেয়ে সে এগিয়েই চলেছে।

কেউ আশ্রয় দিলে থাকে। না হয় তারায় ভরা আকাশ তলে রাত কাটায়। ঝড়-জল উপেক্ষা করে অবিরাম পথ চলে।

পথে যাকে পায় তাকেই শুধায় : হ্যাগা, তিনটি ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে কোথাও দেখেছ?

সবাই হাঁ করে চেয়ে থাকে।

: দেখো নি? ছুটি ছেলে আর একটি মেয়ে?

কেউ জবাব দেয় না দেখে ভিখারিণী আবার বলে : তিনটি ছেলেমেয়ে গো—রেনি-জাঁ, গ্রোস-আলাঁ আর জর্জেত্‌। দেখো নি, তাদের?

পথিকরা যে যার কাযে চলে যায়।

ভিখারিণী কখনো কাঁদে, কখনো বুক চাপড়ায়।

একদিন একটি কৃষক তাকে শুধালো : তিনটি ছেলেমেয়ে বলছো না ?

: হ্যাগো।

: দুটি ছেলে ?

: আর একটি মেয়ে।

: হু। শুনেছি বটে একজন মালিক তিনটি ছেলেমেয়েকে আটকে রেখেছে।

ভিখারিণী চীৎকার করে উঠলো : কোথায় সে ? কোথায় তারা ?

: লা তুর্গ্ দুর্গে।

: সে কতো দূরে ?

: তা জানি না।

: কোন্ দিকে ?

: ঠিক জানি না। তবে শুনেছি ফুজারের দিকে।

: কোন্ পথে যাব ?

: সোজা চলে যাও পশ্চিম দিকে।

ভিখারিণী ছুটলো সূর্যাস্তের পানে।

পিছন হতে কৃষক চেঁচিয়ে বললো : কিন্তু সাবধান। সেখানে এখন জোর লড়াই চলেছে।

ভিখারিণী এগিয়েই চললো।

একটি গ্রামের মধ্যে ঢুকে দেখা হলো এক কৃষাণীর সাথে।

ভিখারিণী শুধালো : হ্যাগো, লা তুর্গ্ যাবো কোন্ পথে ?

কৃষাণী চমকে উঠলো না ভুর্গের নামে। বললো : জানি না। আর জানলেও বলবো না। সে বড়ো খারাপ জায়গা। কেউ সেখানে যায় না।

: কিন্তু আমাকে তো যেতেই হবে। আমার বাছারা যে সেখানে আটক আছে।

ভিখারিণীর দুচোখে নামলো অশ্রুধারা।

কৃষাণীর দয়া হলো। যাবার পথ দেখিয়ে দিয়ে বললো : না জানি কতো দিন তোমার খাওয়া হয় নাই। নাও, এই রুটিখানা খেও।

হাত পেতে কালো রুটিখানা নিয়ে ভিখারিণী আবার ছুটলো।

গ্রামের শেষ প্রান্তে তিনটি উলংগ শিশুকে দেখতে পেয়ে রুদ্ধশ্বাসে এগিয়ে গেলো তাদের দিকে।

কাছে যেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো নিজের মনে : এ যে দুটি মেয়ে আর একটি ছেলে।

হাতের রুটিখানা তাদের দিয়ে ভিখারিণী সামনের জংলা পথে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

এই ভিখারিণী সন্তানহারা মিসেল ফ্রেসার।

* * * *

সূর্য অস্তাচলে গেলো।

প্রতীক্ষিত মুহূর্ত সমাগতপ্রায়।

ঝড়ের মুখে বিরাট বনস্পতির মতো দাঁড়িয়ে আছে গোভাঁ— স্থির, অচঞ্চল। পাশে দাঁড়িয়ে সহকারী গেসাঁ।

সার্জেণ্ট রাত্নব এসে অভিবাদন জানালো।

ঃ কি সংবাদ সার্জেণ্ট রাত্নব ?

ঃ 'বনেট রুজ' বাহিনীর পক্ষ হয়ে আপনার কাছে একটি নিবেদন জানাতে এসেছি।

ঃ অসংকোচে বলো।

ঃ আমাদের মরবার অনুমতি দিন সেনাপতি।

ঃ অর্থাত্ ?

ঃ না দুর্গ আক্রমণের প্রথম অধিকার আমরা প্রার্থনা করি।

ঃ কিন্তু তোমাদের আমি রিজার্ভ রাখতে চাই সর্বশেষ আঘাত হানবার জন্যে।

ঃ সকলের সামনে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করবার অধিকার প্যারির চিরদিনের গৌরব। আর তাছাড়া—ভেবে দেখুন সেনাপতি,—আমাদেরি তিনটি শিশু-সন্তান এই দুর্গে আটক রয়েছে। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আমাদের। হয় তাদের রক্ষা করব, না হয় প্রাণ দেব।

উল্লসিত কণ্ঠে গোভাঁ বললোঃ তাই হোক সার্জেণ্ট, তাই হোক। তোমার বীরত্বে আমি মুগ্ধ। তোমাদের দ্বাদশ বীরকে আমি দুই দলে ভাগ করবো। একদল থাকবে পুরোভাগে, আর একদল সর্বপশ্চাতে।

ঃ আর আমিই কি থাকবো তাদের অধিনায়ক ?

ঃ নিশ্চয়।

ঃ ধন্যবাদ সেনাপতি। আমি থাকবো সকলের আগে।

আর একবার অভিবাদন জানিয়ে সার্জেণ্ট রাত্রুব চলে গেলো।

গোভাঁ পকেট থেকে ঘড়ি বের করে দেখলো। গেসাঁ-র কানে কানে বললো কয়েকটি কথা। আক্রমণকারী সেনাদল তৈরী হতে লাগলো একে একে।

এখনি সুরু হবে সংগ্রাম। চরম সংঘর্ষ।

সিমুরদ্যাব মন গভীর উল্লাসে শান্ত। লাঁতিনাকের মৃত্যুতে হবে ভাঁদির মৃত্যু। আর ভাঁদিব মৃত্যুতে রক্ষা পাবে ফ্রান্স। কী আনন্দ!

সংগে সংগে একটা দুশ্চিন্তার কালো ছায়া নেমে এলো তাঁর মুখে। বড় ভীষণ এই আসন্ন সংগ্রাম। গোভাঁ হবে তার সেনাপতি। যুদ্ধের নামে সে পাগল। যদি শত্রুর অস্ত্রাঘাতে সে মরে! গোভাঁ যে তাঁর পুত্রোপম শিষ্য। বিশাল জগতে তাঁর একমাত্র স্নেহ-বন্ধন।

বিচিত্র নিয়তি। তাঁর জীবনের দুই পাশে গোভাঁ-পরিবারের দুই বংশধর। একজনের মৃত্যু তাঁর কাম্য, অপরের জীবন তাঁর কাছে প্রিয়তম।

কি ভেবে সিমুরদ্যা উঠে দাঁড়ালো। এগিয়ে চললো ভেরী-বাদকের দিকে।

অকস্মাৎ বেজে উঠলো রণভেরী

দুর্গ-চূড়ায় প্রত্যুত্তরে হলো শিঙা-ধ্বনি।

আবার বাজলো রণভেরী।

বাজলো শিঙা।

বিস্মিত হয়ে ফিরে তাকালো গোভাঁ। ফিরে তাকালো কর্মব্যস্ত সেনাদল।

সিমুরদাঁ এগিয়ে গেলো দুর্গের নিচে। তাঁর হাতে একখানি সাদা রুমাল।

সিমুরদাঁ বলে উঠলো : দুর্গবাসিগণ, আমাকে চিনতে পারো কি?

উপর হতে ভেসে এলো ইমানুর স্বর : চিনি।

: আমি গণ-নিরাপত্তা পরিষদের প্রতিভূ।

: তুমি পুরোহিত।

: আমি ন্যায়ের প্রতিনিধি।

: তুমি স্বধর্মত্যাগী।

: আমাকে পেলে কি তোমরা খুসি হও?

: এখানে আমরা আঠারো জন আছি। তোমার মাথার বিনিময়ে আঠারোটা মাথা দিতে আমরা রাজী।

: বেশ। আমি আত্মসমর্পণ করছি তোমাদের কাছে।

উপর হতে ভেসে এলো উন্মাদ অট্টহাস্য : বেশ, চলে এসো তাহলে

: কিন্তু এক সর্তে।

: কি?

: আমার বিনিময়ে লাঁতিনাককে দিতে হবে।

: কেন ?

: দ্যাখো, কি হবে এতো রক্তপাত করে ? দুজনের প্রাণ বলি দিলে যদি গোলযোগ মেটে, কেন অকারণে এতোগুলি নরহত্যা করবে ?

: দুজনের মানে ?

: লাঁতিনাকের আর আমার। ভেবে দ্যাখো ইমানু, এই দুজনের প্রত্যেকেই একাই একশো : আমাদের কাছে লাঁতিনাক আর তোমাদের কাছে আমি। আমার প্রস্তাবে রাজী হও, সকলের জীবন রক্ষা হোক। লাঁতিনাককে দাও আমাদের হাতে, আর আমাকে নাও তোমরা। লাঁতিনাককে আমরা গিলোটিনে চড়াব ; আমাকে নিয়ে তোমরা করো যা তোমাদের খুশি।

ভেসে এলো উন্মাদ অট্টহাসি : তুমি শুধু শয়তান নও, তুমি পাগল। মঁসিয়েকে ছেড়ে দেব তোমাদের হাতে ? অসম্ভব।

: অন্যথায় ফল হবে ভয়াবহ।

: আমরা প্রস্তুত !

: বেশ, তবে তাই হোক।

—আট—

সংগ্রাম সুরু হলো।

এক দিকে সাড়ে চার হাজার বিপ্লবী সৈনিক। কামান-বন্দুক-অস্ত্রে সুসজ্জিত। অন্য দিকে সুদৃঢ় দুর্গের নিরাপদ আশ্রয়ে অবরুদ্ধ উনিশটি বীর সেনানায়ক—সমরে দুর্ধর্ষ, নিষ্ঠুরতায় অদ্বিতীয়।

গোভাঁব নির্দেশক্রমে আক্রমণ সুরু হলো দুর্গের পিছনকার বুরুজের ভগ্ন-প্রাচীরের পথে।

এই দুর্গে গোভাঁ মানুষ হয়েছে ছোটবেলায়। তার অলি-গলির সন্ধান সে জানে। দশ হাত পুরু এর দেয়াল। অনর্গল কামান দেগেও এর কিছু করা যাবে না। কাজেই কামানের যুদ্ধ এখানে নিরর্থক। দূর পাল্লার যুদ্ধ এখানে অচল। চালাতে হবে হাতাহাতি যুদ্ধ। একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে দুর্গের ভিতরে। কুড়াল, ছোরা, পিস্তল, হাত আর দাঁত—এই এ যুদ্ধের উপযোগী অস্ত্র। দংশন-ক্ষত শ্যেনবিহংগ যুঝে ভুজংগ সনে।

সামনের সেতু-পথে আক্রমণ করা অসম্ভব। তিনটি শিশুর জীবন তাহলে বিপন্ন হবে। পণ্ড হবে সব আয়োজন।

বুরুজের ভগ্ন-প্রাচীরই তাই একমাত্র পথ।

প্রাচীর পার হলেই একতলার হল। হলের মাঝামাঝি আর একটি প্রাচীর এমন সুকৌশলে তৈরী করা হয়েছে যে,

এক দিকে তাতে দোতলায় উঠবার ঘোরানো সিঁড়িটা সুরক্ষিত হয়েছে, অন্য দিকে আবার তার পিছনে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে সেই প্রাচীরের ছিদ্রপথে শত্রুদলকে আক্রমণ করা চলে নিরাপদ-অন্তরালে থেকে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলেই একতলার মাথায় একটা ছোট গোল ঘর—নানা অস্ত্রশস্ত্রে সাজানো। কবেকার কোন্ শত্রু-পক্ষের গোলাবর্ষণে এই গোল-ঘরের দেওয়ালে একটা গর্ত হয়ে আছে। সেই ছিদ্রপথে চাঁদের আলো পড়ে অস্ত্রশস্ত্রগুলো ঝক্‌মক্ করছে।

গোল ঘর থেকে ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলেই তে-তলার গোল ঘর। এই ঘরের সংগেই সেতু-পথের উপরকার দালানের যোগাযোগ। মাঝখানে লোহার দরজা। তার নিচে ছিদ্র-পথে বসানো হয়েছে গন্ধক-শলা। পাশে দাউ দাউ করে জ্বলছে একটা মশাল।

অবরুদ্ধ লাঁতিনাক-দলেরও আয়োজনের ত্রুটি নাই। কিন্তু ত্রুটি তাদের মূল বস্তুতে: যথেষ্ট গোলা-বারুদ তাদের নাই। যথেষ্ট বারুদ যদি থাকতো, লা তুর্গ্ দুর্গ তারা উড়িয়ে দিতে পারতো শত্রুমিত্রসহ। যথেষ্ট বন্দুক-পিস্তল তাদের আছে। কিন্তু কার্তুজ নাই। সমস্ত কার্তুজ তারা বন্দুকে ভরে রেখেছে। কিন্তু সে কটা? কতোক্ষণ?

দু পক্ষের উদ্যোগ্-আয়োজন বিচার করলে পরিস্থিতিটা সংক্ষেপে তাহলে এই দাঁড়ায়:

আক্রমণকারীদের পার হতে হবে একটি ভাঙা দেওয়াল ; দখল করতে হবে একটা ব্যারিকেড ; শুধু গায়ের জোরে একে একে দখল করতে হবে তিনটি ঘর ; আর বুলেটের ঝড়ের ভিতর দিয়ে বেয়ে উঠতে হবে দুটো ঘোরানো সিঁড়ি।

আর অবরুদ্ধদের সামনে প্রাণপণে লড়বার পর নিশ্চিত মৃত্যু।

ভীষণ—বীভত্‌স যুদ্ধ।

যুদ্ধের প্রথম অধ্যায় চলেছে ভাঙা দেয়ালের গুহা-পথে ; গুহাই বটে ; দশ হাত লম্বা একটা সুরংগ। চারদিকে ভাঙা ইট আর পাথর। গ্রানিট পাথরে মাথা ঠুকে যায়। পায়ের নিচে চুন-সুরকি ঝুরঝুর করে ঝরে। অন্ধকারে চোখে ধাঁধা লাগে। একটা হাঙর যেন অগুনতি দাঁত মেলে হাঁ করে আছে নররক্ত লালসায়।

তারি মধ্যে অবিরাম গুলি ছুটছে উনিশটা বন্দুকের মুখে। বিপ্লবী সৈন্য মরছে ঝড়ের পাতার মতো। তাদের বুকের উপর দিয়ে চলেছে পিছনের সৈন্য।

চীত্‌কার—আর্তনাদ—হাহাকার।

লাঁতিনাক চেঁচিয়ে উঠলো : নির্ভয়ে গুলি চালাও।

গর্জে উঠলো গোঁভার বজ্রস্বর : আক্রমণ করো।

কানে এলো কার মৃদু ডাক : গোভাঁ!

গোভাঁ চমকে উঠলো ঃ মাস্টার মশায়, আপনি কেন এখানে এলেন ?

ঃ আমি এসেছি তোমার কাছে।

ঃ কিন্তু এখানে যে অনিবার্য মৃত্যু।

ঃ তবে—তবে তুমি এখানে কেন ?

ঃ আমার এখানে দরকার—আপনার নয়।

ঃ কিন্তু তুমি যখন এখানে আছ, আমাকে তো থাকতেই হবে।

ঃ না মাস্টার মশায়, না।

ঃ হাঁ বাবা, হাঁ।

সিমরদাঁ কিছুতেই গোভাঁকে ছেড়ে গেলো না। হায় রে প্রাণ-বন্ধন !

রক্তের স্রোত আর স্তূপীকৃত শবের উপর দিয়ে যুদ্ধ এগিয়ে এলো হল ঘরে।

লাঁতিনাক দলের আর জন পনেরো অবশিষ্ট আছে। তারো একজন—শাঁতে-অঁ-হাইবার—গুরুতর আহত। তার একটা চোখ ছুটে বেরিয়ে গেছে। কোন ক্রমে টলতে টলতে দোতলার গোল ঘরে সে আশ্রয় নিয়েছে। ছিদ্রপথের খোলা হাওয়ায় সে জোরে জোরে শ্বাস টানছে বসে।

কিন্তু অবাধ নরবলি চলেছে ব্যারিকেডের সামনে। সে দিকে চেয়ে গোভাঁ শিউরে উঠলো। চেঁচিয়ে বললো :

ব্যারিকেড আক্রমণ করো। কেউ কি এই ব্যারিকেডটা বেয়ে পার হতে পারে না?

এগিয়ে এলো সার্জেণ্ট রাহুব: আমি পারি।

বলেই সে হঠাত ঘুরে দাঁড়ালো। অগ্রগামী বিপ্লবী বাহিনীকে ঠেলে ছুটে বেরিয়ে গেলো সুরংগ-পথে।

পালিয়ে গেলো? সার্জেণ্ট রাহুব কি পালিয়ে গেলো শত্রুর ভয়ে?

দুর্গের বাইরে এসে চোখ মুছে দাঁড়ালো রাহুব। ছুঁড়ে ফেলে দিলো হাতের বন্দুক। খুলে ফেললো ঘাড়ের বেল্ট। খুললো কোট ও জ্যাকেট। খুললো জুতা। পিস্তল দুটো গুঁজে নিলো কোমড়ের বেল্টের নিচে। খোলা তলোয়ার কামড়ে ধরলো দাঁতের ফাঁকে। তারপর বেড়ালের মতো বেয়ে উঠতে লাগলো ফাঁটলধরা পুরানো দেয়াল।

হাত পঁচিশেক উঠে দেয়ালের গায়ে পেলো একটা গর্ত। কবেকার কোন্ শত্রুর গোলাবর্ষণে দেয়ালের খানিকটা আড়াআড়ি ভাবে ফেটে গেছে। একটা মানুষ অনায়াসে তার ভিতর দিয়ে গলে যেতে পারে।

দু হাত একসংগে গর্তের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে এক ঝাঁকিতে রাহুব কোমড় পর্যন্ত শরীরের অর্ধেকটা সহ দোতলার গোল ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো। আর একটা ঝাঁকিতেই সে নিরাপদ হবে।

শিকার-লোলুপ বাঘের মতো তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো

একটা লোক। বিদ্যুত-গতিতে সে এক হাতে খুলে নিলো তার কোমড়ের দুটো পিস্তল, অন্য হাতে নিলো মুখের তরবারি।

চমকে রাহুব মুখ তুললো।

বিকৃত বীভত্‌স মুখ। একটা চোখ নেই। চোয়াল ভাঙা। সারা মুখ রক্তে লাল। লাল মুখোস যেন আঁটা। সে-মুখের মালিক শাঁতে-অঁ-হাইবার।

মুহূর্ত বিলম্ব নয়। রাহুব এক ঝটকায় ঘরের মেঝেয় ঢুকেই উঠে দাঁড়ালো। সিংহের মতো জাপটে ধরলো শাঁতে-অঁ-হাইবারকে।

কিছুক্ষণ চললো ধ্বস্তাধ্বস্তি। এক জন নিরস্ত্র! অপর জন সশস্ত্র। কিন্তু শাঁতে-অঁ-হাইবারের এক হাতে দুটো পিস্তল থাকায় সে গুলি ছুড়তে পারছে না। তার উপর সে আহত— দুর্বল। তার শরীর কাঁপছে থর্‌থর্ করে। তবু একবার প্রাণপণ শক্তিতে তরবারির আঘাত করলো রাহুবের গলা লক্ষ্য করে।

বিদ্যুত-গতিতে রাহুব তাকে ঠেলে দিলো এক ঝটকায়। তবু আঘাতের হাত থেকে সে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পেলো না। লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে তরবারির আঘাত লাগলো তার কাঁধে। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটলো।

শাঁতে-অঁ-হাইবারও সে-ধাক্কায় ছিটকে পড়লো পিছনের দেয়ালে। হাতের তরবারি ঝনঝন করে মেঝেয় পড়ে গেলো

হাত থেকে। তাতে বুঝি তার ভালোই হলো। দুই হাতে সে বাগিয়ে ধরলো দুই পিস্তল। তখনো তার হাত কাঁপছে।

প্রথম পিস্তলের গুলিতে রাহুবের একটা কান উড়ে গেলো।

এইবার দ্বিতীয় পিস্তল।

কিন্তু আর নয়।

রাহুব এমন জোরে তাকে ধাক্কা দিলো আবার সে হাতের পিস্তল ছিটকে পড়লো। গুলি লাগলো ঘরের সিলিং-এ। হিংস্র বাঘের মতো রাহুব দুই হাতে চেপে ধরলো শাঁতে-অ-হাইবারের ভাঙা চোয়াল। তীব্র আক্রোশে তার মাথাটাকে মোচড়াতে লাগলো।

আর্তনাদ করে বেচারা সেখানেই ঢলে পড়লো। কয়েকবার হাত-পা ছুড়লো।

তারপর সব শেষ।

মেঝে থেকে তরবারিখানা কুড়িয়ে নিয়ে রাহুব এগিয়ে গেলো দরজার দিকে। ঘরের এককোণে চোখ পড়তেই সে থমকে দাঁড়ালো। পরপর সাজানো রয়েছে নানা অস্ত্র: পিস্তল, বন্দুক, তরবারি—কতো।

আনন্দে বাঁ হাতের তালুতে একটা ঘুসি মেরে রাহুব দুই হাতে নিলো দুই পিস্তল। এক লাফে দরজার কাছে যেয়ে গুলি ছুড়লো দুবার। আবার নিলো একটা গাদা বন্দুক। লক্ষ্যহীন ভাবে ছুড়লো একে একে পনেরোটা গুলি। গুলির শব্দে পুরানো

দুর্গ গম-গম্ করে উঠলো। উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলো রাভূব ঃ জয়—প্যারির জয়।

আর একটি গাদা বন্দুক সিঁড়ির দিকে মুখ করে বাগিয়ে ধরে সে চুপ ক'রে দাঁড়ালো দরজার আড়ালে।

ব্যারিকেডের নিরাপদ আশ্রয়ে নিচের হল ঘরে এতোক্ষণ যারা যুদ্ধ করছিলো, উপরে অবিরাম গুলির শব্দে আতংকে তাদের বুক কেঁপে উঠলো।

মার্কুইস চেঁচিয়ে বললো ঃ শত্রুরা দোতলায় ঢুকে পড়েছে। মুহূর্ত দেরী না করে সবাই ছুটে যাও তে-তলার ঘরে। সেখান থেকেই সুরু হবে নতুন আক্রমণ।

সবাই ছুটলো উপরে। মার্কুইস সকলের শেষে। সে যে সেনাপতি। সেনাপতির এই সাহসই তাকে এবারের মতো বাঁচালো।

গোল-ঘরের সামনের সিঁড়িতে যে-ই উঠে আসে, অজ্ঞাত হাতের অবিরাম গুলিবর্ষণের মুখে সেই ঢলে পড়ে। মার্কুইস যদি প্রথম ছুটতো তেতলার দিকে, তারো মৃত্যু ছিলো অনিবার্য।

রাভূবের হাতের বন্দুকের গুলি ফুরিয়ে গেলো। আর একটি বন্দুক আনতে সে পিছন ফিরলো। লাঁতিনাক-দলের অবশিষ্ট সৈনিকরা সেই ফাঁকে তেতলার ঘরে উঠে গেলো।

সংগে সংগে দোতলায় উঠে এলো গোভাঁ। সংগে

সৈন্যদল। শত্রুপক্ষের এই আকস্মিক পশ্চাদপসরণে তারা বিস্ময়ে বিমূঢ়।

হাসিমুখে অভিবাদন করলো সার্জেন্ট রাতুব: আমি এখানে রয়েছি। দোল-যুদ্ধের কথা আমি ভুলি নাই। দু-মুখো আক্রমণের নীতি তো আপনার কাছেই শিখেছি সেনাপতি।

গোভাঁ তাকে জড়িয়ে ধরলো: সাবাস সার্জেণ্ট রাতুব, সাবাস। অসাধ্য সাধন তুমি করেছ। কিন্তু একি? তোমার সমস্ত শরীর রক্তাক্ত। তুমি আহত।

: ও কিছু নয়। মানুষের কান একটা কম থাকলেই কি আর বেশী থাকলেই কি। আর অস্ত্রাঘাত? এতগুলি মানুষ মারতে একটু-আধটু কাটবেই তো।

ছুটতে ছুটতে উঠে এলো সিমুরদ্যাঁ। তাঁর হাতে লণ্ঠন। তেতলার দিকে আঙুল বাড়িয়ে সে বললো: এইবার শেষ আঘাত।

*　　　*　　　*　　　*

অবশিষ্ট মাত্র সাত জন।

মার্কুইস ও ইমানু ছাড়া সবাই আহত।

গোলা-গুলি ফুরিয়ে গেছে। কার্তুজের বাক্স শূন্যপ্রায়; সাত জনের ভাগে রয়েছে মাত্র চারটি গুলি।

অনিবার্য মৃত্যু।

পালাবার পথ নাই। সেতু-পথের মুখে শত্রুপক্ষের ছয়টি কামান যমের মতো হাঁ করে আছে। নিচের সিঁড়িতে বহু মানুষের পদধ্বনি: মৃত্যুর পদশব্দ যেন।

গম্ভীর গলায় কথা বললো মার্ক্‌ইস : বন্ধুগণ, সব শেষ। মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হও।

অকস্মাত তাদের পিছন হতে ধ্বনিত হলো কার অদৃশ্য কণ্ঠের স্বর : কেমন? আমি বলেছিলাম না মঁসিয়ে?

অবাক বিস্ময়ে সকলে ফিরে তাকালো।

কেউ নাই।

দেয়ালের মাঝখানে একখানা পাথর ধীরে ধীরে ঘুরে যাচ্ছে।

দেখতে দেখতে পাথরের দুই পাশে দুটি পথ খুলে গেলো। ছোট হলেও দু জন মানুষ তার ভিতর দিয়ে সহজেই ঢুকতে পারে।

সেই ফাঁকে দেখা দিলো একখানি মুখ।

মার্ক্‌ইস সহজেই চিনলো—সে মুখ হাল্‌মালোর।

: হালমালো, তুমি?

: হ্যাঁ মঁসিয়ে। দেখলেন তো, সত্যি পাথর নড়ে। কিন্তু আর সময় নষ্ট করবেন না। চলে আসুন আমার সাথে। ওই গোপন সুরংগ-পথে দশ মিনিটের মধ্যেই আমরা গভীর বনে পৌঁছে যাবো।

সংগীরা এক সাথে বলে উঠলো : আপনি আগে যান মঁসিয়ে।

: না, তোমরা আগে যাও। তোমরা আহত।

: আবার কোথায় দেখা হবে?

: পিয়্যারে গোভেঁর জংগলে। কাল ঠিক দুপুরে। সবাই উপস্থিত থেকো। আজীবন আমরা এ-যুদ্ধ চালাবো।

ইমানু হালমালোর কাঁধে হাত রেখে শুধালো: কমরেড, এখান থেকে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছিতে কত ক্ষণ লাগবে?

: প্রায় এক কোয়ার্টার। কিন্তু আপনারা আর দেরী করবেন না মঁসিয়ে। আমি এই গুপ্ত পথ খুলতেই জানি, বন্ধ করতে পারি না। কাযেই শত্রুরা এখানে পৌঁছিবার আগেই আমাদের অনেক দূর চলে যেতে হবে। নইলে তারা যদি একবার সুরংগ-পথে পিছু নেয়, তাহলে আর রক্ষা থাকবে না।

এত কথা শুনবার অবসর ইমানুর নাই। সে তখন কর্মব্যস্ত।

ঘরের কোনায় ছিলো একটা মস্ত বড় ভারী ওক কাঠের বাক্স। এক কালে সেটাতে হয়তো জামাকাপড় রাখা হতো। সেটাকে টেনে এনে ইমানু বসিয়ে দিলো নিচে নামবার সিঁড়ির দরজার মুখে। শুধু মাথার দিকে খানিকটা ফাঁক রেখে দরজাটা সম্পূর্ণ আটকে গেলো।

মার্কুইস বললো: একটা কাঠের বাক্স দিয়ে সংগীন-বন্দুকধারী শত্রুকে পনেরো মিনিট আটকে রাখতে পারবে কে?

: আমি।—উত্তর দিলো ইমানু।

: তুমি?

: আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনাদের ছয়জনের মধ্যে পাঁচজন আহত। আমার গায় একটি আঁচড়ও লাগে নি।

: আমারও না।

: কিন্তু মঁসিয়ে, আপনি দলপতি আর আমি সৈনিক। দলপতি আর সৈনিক আলাদা।

: কিন্তু আমারও একটা কর্তব্য আছে।

: না মঁসিয়ে, আপনার আর আমার সম্মুখে আজ একই কর্তব্য—আপনার জীবন রক্ষা।

সংগীদের দিকে ফিরে ইমানু আরো বললো: কমরেড, এখন একমাত্র কায শত্রুদের পথ আটকে রাখা। তোমরা সবাই আহত। আমার শরীর থেকে এক ফোঁটা রক্তও পড়ে নি। কাযেই এ-কাযের উপযুক্ত একমাত্র আমি। তোমরা পালাও। রেখে যাও তোমাদের অস্ত্র। আমি কথা দিচ্ছি, শত্রুদের আধ ঘণ্টা আমি আটকে রাখবোই।

সবাই চুপ।

আবার কথা বললো ইমানু: গুলিভরা পিস্তল কটা আছে?

: চারটি।

: মাটিতে রেখে দাও।

নীরবে তার আদেশ পালন করলো সকলে।

: ব্যস। আমি রইলাম শত্রুর সাথে কথা বলতে। তোমরা পালাও—পালাও।

বাইরে অগনিত পদধ্বনি।

কাঠের বাক্সের উপর সংগীনের আঘাতের শব্দ। শব্দ হলো একটা পিস্তলের।

এক লাফে ইমানু ছুটে গেলো বাক্সের আড়ালে। হাটু গেড়ে বসলো দু হাতে দুই পিস্তল ধরে।

মাথার উপর ঝুলছে মৃত্যুর খড়্গ। কথা বলবার সময় নাই।

সকলে একে একে পা দিলো গুপ্ত সুরংগের পথে।

ঃ আস্থন মঁসিয়ে।—বললো হালমালো।

পকেট থেকে পেন্সিল বের করে মার্কুইস কি যেন লিখলো নড়া পাথরের গায়। তারপর দ্রুত পদক্ষেপে অদৃশ্য হয়ে গেলো সুরংগের অন্ধকারে।

ইমানু একা।

বিপক্ষ দলে অগনিত সৈন্য।

মাঝখানে একটি ওক কাঠের বাক্স। আঘাতে আঘাতে বাক্সের গায়ে ছুটো ফুঁটো হয়েছে,—একটা নিচে, একটা উপরে।

উপরের ছিদ্রপথে ইমানু দেখালো, একটা চোখ তার দিকে চেয়ে আছে।

গর্জে উঠলো তার হাতের পিস্তল। বাক্সের ও পাশে উঠলো মরণ-আর্তনাদ।

ছিদ্রপথে চোখ রেখে দেখলো—একটা লোক সাপের মতো বুকে হেটে এগিয়ে আসছে সিঁড়ি বেয়ে। তার পিছনে আর একটি।

গর্জে উঠলো তার হাতের পিস্তল। আর একটি আর্তনাদ শোনা গেলো। সৈনিক গড়িয়ে পড়লো বাঁকানো সিঁড়ি দিয়ে।

শূন্য পিস্তল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ইমানু হাত বাড়ালো তৃতীয় পিস্তল তুলতে।

সেই হাত মাঝপথে থেমে গেলো। তীব্র কণ্ঠে সে আর্তনাদ করে উঠলো।

কাঠের বাক্সের নিচেকার ছিদ্র পথে একখানি অদৃশ্য হাতের শানিত কৃপাণ আমূল বিদ্ধ হয়েছে ইমানুর তলপেটে।

তবু সে লুটিয়ে পড়লো না মাটিতে। দাঁতে দাঁত চেপে বললো: আচ্ছা।

কোন মতে টলতে টলতে সে লৌহ-দ্বারের কাছে পৌঁছিল। পাশেই মশাল জ্বলছে।

বাঁ হাতে পেটের বেড়িয়ে আসা নাড়িভুড়ি চেপে ধরে ডান হাতে কাত করে ধরলো জ্বলন্ত মশাল।

লোহার দরজার নিচেকার গন্ধক-শলায় আগুন ধরে উঠলো।

মশাল ফেলে দিয়ে আবার হাতে নিলো পিস্তল। কাঁপতে কাঁপতে শুয়ে পড়লো মেঝেয় বিছানো পতাকার উপর। আর প্রাণপণ শক্তিতে ফুঁ দিতে লাগলো গন্ধক-শলায়।

আগুনের রেখা নাচতে নাচতে এগিয়ে চললো। পার হলো লৌহ-দরজা। ওপাশে সেতু-পথের উপরকার ঘরে আছে আলকাতরা আর শুকনো কাঠ।

ইমানুর মুখে ফুটে উঠলো ম্লান হাসি: এরা আমাকে চিরদিন মনে রাখবে। 'টেম্পল টাওয়ার' এ বন্দী রাজ-শিশুর মন্দভাগ্যের প্রতিশোধ আমি নিলাম এই শিশু তিনটিকে হত্যা করে।

ঠিক সেই মুহূর্তে কাঠের বাক্সটাকে সশব্দে উল্টে ফেলে

এক লাফে বেরিয়ে এলো রাদুব। হাতে খোলা তলোয়ার।

চীতকার করে সে বললো: কোথায় শয়তানের দল, এসো এইবার।

উত্তর এলো পিস্তলের শব্দে। একটা গুলি তার কনুইয়ের নিচ দিয়ে দেয়ালে যেয়ে বিঁধলো।

: কে ?

: আমি ?

: তুমি আমার বন্দী।

: বটে !

ইমানু জ্বলন্ত গন্ধক-শলার উপর কাত হয়ে পড়লো।

আগুনের শিখাটাকে আরো একটু বাড়িয়ে দিয়ে তার শেষ নিশ্বাস চিরতরে থেমে গেলো।

ঘরে ঢুকলো গোভাঁ ও সিমুরদ্যাঁ।

লণ্ঠনের আলোয় সিমুরদ্যাঁ দেখলো—দেয়ালের গায়ে গুপ্ত-পথের মুখে এক খণ্ড ঘুরানো পাথর। তাতে লেখা:

বিদায়। লাঁতিনাক।

অপলক চোখে সিমুরদ্যাঁ প্রস্তর-ফলকের দিকেই চেয়ে রইলো।

—নয়—

একটা পাহাড়ের নিচে এসে সুরংগ-পথ শেষ হয়েছে। সেখানে দাঁড়িয়ে মার্কুইস একা। হালমালো চলে গেছে।

সমস্ত পাহাড়টা ঘন-জংগলে ঢাকা। দিনের পর দিন সেখানে আত্মগোপন করে থাকলেও কেউ টের পাবে না।

মার্কুইস পকেট থেকে ঘড়ি বের করলো।

দশটা বাজে।

রাত আটটায় সুরু হয়েছে প্রলয়-সংগ্রাম। দশটায়ই শেষ। বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না, মাত্র একশো কুড়ি মিনিটে এতো বড় একটা ব্যাপার ঘটে গেছে।

চিন্তিত পদক্ষেপে মার্কুইস পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে উঠতে লাগলো।

অকস্মাত একটা আর্ত চীতকারে সমস্ত ফুজারে বনভূমি যেন কেঁপে উঠলো। মার্কুইস ফিরে তাকালো।

* * * *

কাঁদছে এক ভিখারিণী। কাঁদছে সন্তানহারা জননী। কাঁদছে মিসেল ফ্লেসার।

লা তুর্গ্ দুর্গের সেতু-পথের উপরকার দালানের একতলায় আগুন লেগেছে। ছিদ্র পথে জিহ্বা মেলছে আগুনের লেলিহান শিখা। মৃত্যু-কালো ধোঁয়ায় আকাশ ছেয়ে গেছে।

ওই দালানের দোতলায় রুদ্ধদ্বার ঘরে রয়েছে তিনটি অসহায় শিশু : গ্রস-আলাঁ, রেনি-জঁা ও জর্জেত্।

তাই বুকে করাঘাত করে কাঁদছে অভাগিনী জননী। চুল ছিঁড়ছে দুই হাতে। মাথা খুঁড়ছে মাটিতে আর কাঁদছে। কাঁদছে আর চীতকার করছে : দোহাই ঈশ্বরের ! রক্ষা করো—রক্ষা করো। আমার বাছাদের বাঁচাও। আগুন—আগুন—আগুন। আগুনে পুড়ে মলো আমার সোনার চাঁদরা। বাঁচাও—তাদের বাঁচাও। ওই যে দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলছে। কে আমার মানিকদের ওখানে রেখেছে ? কোন্ সে পাপিষ্ঠ ? ঈশ্বর তার বিচার করবেন। তার সব পুড়ে যাবে। ছাই হয়ে যাবে। ওরে আমার বাছারে !

দুর্গের নিচে লোক জড়ো হলো অনেক। সিমুরদ্যাঁ, গোভাঁ, রাদুব —সবাই এলো। কিন্তু নিরুপায়। কিছুই করবার উপায় নাই। অবস্থার চক্রে চার হাজার মানুষ সমবেত হয়েও তিনটি শিশুর প্রাণ বাঁচাতে অক্ষম।

* * *

পাহাড়ের মাঝপথে দাঁড়িয়ে মার্ক্ইস একবার পকেটে হাত দিলো। লৌহ-দ্বারের চাবি ঠিকই আছে।

তারপর দ্রুত পা ফেলে নেমে এলো নিচে।

গুপ্ত সুরংগ-পথে আবার সে ফিরে এলো তেতলার গোল ঘরে।

খুট্ করে একটা শব্দ হলো।

বিরাট লৌহ-দরজা সশব্দে খুলে গেলো।

এক ঝলক কালো গরম ধোঁয়া লাগলো মার্কুইসের মুখে।

মার্কুইসের ভ্রূক্ষেপ নাই। দৃঢ় পদক্ষেপে সে এগিয়ে চললো মাথা উঁচু করে।

বিমূঢ় জনতা এক দৃষ্টে চেয়ে আছে দোতলার জানালায়। অসহায় তিনটি শিশু ইতস্তত ছুটাছুটি করছে। হবে না—ওদের রক্ষা হবে না। থামবে না অভাগিনী জননীর চোখের জল।

সহসা সেই ঘরে দেখা দিলো দীর্ঘদেহ একটি মানুষ। আগুনের পটভূমিকায় তার মুখ কালো দেখাচ্ছে। কিন্তু মাথায় তার সাদা চুল বাতাসে উড়ছে।

সকলে চিনলো—সে লাঁতিনাক।

ক্ষণেকের জন্য বৃদ্ধ জানালা থেকে সরে গেলো। আবার এলো। তাঁর হাতে একটি মই। ঘরের মেঝেয় মইটি পড়ে ছিলো।

মইটির এক মাথা দুই হাতে শক্ত করে ধরে লাঁতিনাক ধীরে ধীরে জানালা দিয়ে সেটাকে নিচে নামিয়ে দিলো।

সার্জেন্ট রাদুব এগিয়ে যেয়ে ধরলো মইটির অন্য মাথা। আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলো ঃ প্রজাতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক।

উপর হতে চেঁচিয়ে বললো মার্কুইস ঃ রাজা দীর্ঘজীবী হোক।

রাদুব মুখ ভেঙ্চে বললো ঃ যতো খুশি চেঁচাও তুমি। যা খুশি তাই বলো। আজ তুমি দয়ার অবতার।

মইটি ঠিক মতো বসানো হতেই কুড়িটি সৈনিক উঠে গেলো মই বেয়ে। রাদুব তাদের সকলের আগে।

দেখতে দেখতে রাহুবের হাত দোতলার জানালায় পৌঁছিল।

মার্কুইস তার হাতে তুলে দিলো একটি শিশু। সে তাকে নামিয়ে দিলো নিচেকার সৈনিকের হাতে।

এমনি করে হাতে হাতে তিনটি শিশু ফিরে এলো ভিখারিণী জননীর বুকে। সে পাগলের মতো তাদের বুকে জড়িয়ে ধরলো, আদর করে চুমা খেলো। তারপর অতি আনন্দে বিকট চীতকার করে তখনি মুর্চ্ছিত হয়ে পড়লো।

ধীরে ধীরে মই বেয়ে নামতে লাগলো মার্কুইস্ একা। তাঁকে সাহায্য করবার কেউ নেই। সবাই আনন্দে মত্ত।

মার্কুইসের একটি পা যেমনি মাটিতে নেমেছে, অমনি তাঁর কাঁধে কে যেন হাত রাখলো অতি সাবধানে।

মার্কুইস ফিরে তাকালো।

ঃ আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করছি।—বললো সিমুরদ্যাঁ।

ঃ তথাস্তু।—বললো লাঁতিনাক।

—দশ—

লা তুর্গ্ দুর্গের একটা অন্ধকার কুঠরীতে লাঁতিনাক বন্দী।

এক পাশে জ্বলছে একটা মিটমিটে বাতি। এক কুঁজো জল। এক টুকরা রুটি। মেঝেয় বিছানো এক গাদা খড়। বন্দীর শয্যা।

পাশেই এক তলার হল ঘর। কিছুক্ষণ আগেই সেখানে চলেছিলো মরণ-সংগ্রাম। এখন সেখানে বিরাজ করছে মৃত্যু-স্তব্ধতা।

রুদ্ধদ্বার কুঠরীর সামনে সশস্ত্র প্রহরী। অনেক সৈন্য ইতস্তত ঘুমিয়ে আছে হল ঘর জুড়ে।

বুরুজের ভাঙা দেয়ালের বাইরে প্রবেশ-মুখেও সশস্ত্র প্রহরী। কোন পথ নাই পালাবার।

মাঠের এক কোনে অন্ধকারে বসে আছে গোভাঁ। নীরব। নির্জন।

তার একাগ্র দৃষ্টির সামনে রাতের আঁধারে মুখ ঢেকে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে লা তুর্গ্ দুর্গ।

গোভাঁর মনে অনেক চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাত।

মার্কুইস্ লাঁতিনাক। বিপ্লবের শত্রু। দেশের শত্রু। ইংরেজকে সে ডেকে এনেছে সাগর পার হতে। সে হাত মিলিয়েছে পিট, ক্রেগ, কর্ণওয়ালিস আর জলদস্যুদের সাথে;

চীতকার করে সে বলেছে ঃ এসো ইংলণ্ড, ফ্রান্স অধিকার করো। এ হেন দেশদ্রোহীর শাস্তি মৃত্যু।

কিন্তু—

যে-মানুষ ছিলো দেশদ্রোহী লাঁতিনাক, সেই কি লা তুর্গ্ দুর্গের বন্দী লাঁতিনাক? অতীতের ভস্মস্তূপে জন্মে নাই কি নতুন মানুষ?

লাঁতিনাকের সামনে ছিলো ঘন জংগল, মুক্তির খোলা পথ। কিন্তু স্বেচ্ছায় সে ফিরে এলো শত্রু-বেষ্টিত দুর্গে—একক, সহায়হীন। নিজের জীবন বিপন্ন করে ঝাঁপিয়ে পড়লো জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে। তাও আত্ম-স্বার্থের খাতিরে নয়। তিনটি অনাত্মীয় শিশুর প্রাণ বাঁচাতে। তারি পুরস্কার কি হবে গিলোটিন?

নিজের ও পরের জীবন দুদিক থেকে তাঁকে ডাকলো হাত ছানি দিয়ে। সে বেছে নিলো মৃত্যু। কিন্তু তাঁকে বাঁচালো দৈব। সেই মৃত্যুই কি হবে তাঁর এতো বড় বীরত্বের পুরস্কার? উদারতার বিনিময়ে সে কি পাবে বর্বরতা? বিপ্লবের হবে এতো বড় পতন? প্রজাতন্ত্রের এতো বড় অসম্মান?

গভীর উত্তেজনায় গোভাঁ উঠে দাঁড়ালো। দুই হাত পিছনে রেখে পায়চারী করতে লাগলো মন্থর পায়ে। এক সময়ে তার মনে পড়লো সিমুরদ্যাঁর ঘোষণা। সে রূঢ় কণ্ঠস্বর এখনো যেন তার কানে বাজছে ঃ কাল হবে কোর্ট-মার্শাল। পরশু গিলোটিন। ভাঁদির চির-অবসান।

গোভাঁর শরীর শিউরে উঠলো।

দূরের ঘণ্টা-ঘরে রাত দুটো বাজলো।

দৃঢ় পদক্ষেপে গোভাঁ এগিয়ে চললো দুর্গের ভাঙা দেয়ালের দিকে।

শান্ত্রীরা পথ ছেড়ে দিলো সসম্ভ্রমে।

আঁধার গুহা-পথ পার হয়ে গোভাঁ হল ঘরে ঢুকলো।

ভারপ্রাপ্ত অফিসার এগিয়ে এসে অভিবাদন জানালো।

কারাকক্ষের দিকে আঙুল বাড়িয়ে গোভাঁ আদেশ দিলো : দরজা খোলো।

খোলা দরজা দিয়ে গোভাঁ ভিতরে ঢুকলো।

দরজা আবার বন্ধ হয়ে গেলো।

কিছুক্ষণ দুজনেই নীরব।

তারপর হো-হো করে হেসে উঠলো মার্কুইস। জোর গলায় বললো : গুড্ ইভ্নিং স্যার। বহুকাল পরে তোমার দর্শন লাভের সৌভাগ্য হলো। সেই জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। এসো না, একটু কথাই বলা যাক। একা একা একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছি। তোমার বন্ধুরা অকারণে বড় সময় নষ্ট করে। অপরাধীকে সনাক্ত করা, কোর্ট-মার্শাল ডাকা—এতো হৈ-হল্লা কেন রে বাবা!

হ্যাঁ, তারপর—দিন কাল কেমন চলছে? খুব চমতকার, না? এক যে ছিলো রাজা আর তার রাণী। রাজা ছিলো রাজাই আর রাণী হলো ফ্রান্স। সবাই মিলে রাজার মাথাটা ফেললো কেটে, আর রাণীর বিয়ে দিয়ে দিলো রোবেস্পিয়রের

সাথে। তাদের একটি মেয়ে হলো—নাম গিলোটিন। তার সাথেই তো কাল সকালে আমার পূর্বরাগের আয়োজন হয়েছে। না কি বলো ?

হাসতে হাসতে মার্কুইসের স্বর হঠাত তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো: এ-ঘর আমার। একদিন ছিলো যখন লর্ডরা এখানে আটক করে রাখতো বিদূষকদের। আর আজ গেঁয়ো চাষারা বন্দী করে রাখে লর্ডদের। একে তোমরা বলো বিপ্লব ? আশ্চর্য। ছাখো, একটা কথা তোমাকে বলছি। গোভাঁর বংশধর তুমি। তোমার শিরায় বনেদী নীল রক্তের ধারা। সেই রক্ত বইছে আমারো বুকের তলে। অথচ যে-রক্ত আমাকে করেছে সম্ভ্রান্ত মানুষ, সেই রক্তই তোমাকে গড়ে তুলেছে একটা রাস্কেল। এই কি বিপ্লব ?

একটু থেমে নিজেকে সংযত করে মার্কুইস আবার বলতে লাগলো: রাজাকে মারো। বড়ো লোকদের মারো। পুরুতদের মারো। ছিঁড়ে ফেলো। ধ্বংস করো। হত্যা করো। তোমাদের পায়ের তলায় পিষে মারো যতো সব প্রাচীন রীতি আর নীতি। সিংহাসন ভেঙে ফেলো। দেবতার আসনে লাথি মারো। চুরমার করো। নাচো। ধ্বংসের শেষ সীমায় ছুটে যাও। তোমরা বিশ্বাসঘাতক। তোমরা কাপুরুষ। সাধনার শক্তি নাই। ত্যাগের সামর্থ্য নাই। মূর্খ অপদার্থের দল।

তীব্র উত্তেজনায় মার্কুইসের শরীর কাঁপছে। ধীরে ধীরে সে বললো: আমার কথা শেষ হয়েছে। মঁসিয়ে ভাইকাউন্ট,

আমি তোমার একান্ত অনুগত ভৃত্য। এই আবার আমাকে গিলোটিন করো।

উত্তরে গোভাঁ বললো শুধু দুটি কথা : আপনি মুক্ত।

নিজের গায়ের সেনাপতির পোষাক খুলে গোভাঁ সেটাকে বেঁধে দিলো মার্কুইসের গলায়। মাথায় টুপিটা পরিয়ে দিয়ে সেটাকে টেনে দিলো চোখের উপরে। পাছে তাঁর মুখ দেখা যায়।

মার্ক্‌ইস শুধালো : কি করছো ?

দ্বাররক্ষীকে ডেকে গোভাঁ বললো : লেফ্‌টেন্যান্ট, দরজা খোলো।

দরজা খুলে গেলো।

বিস্ময়-বিমূঢ় মার্ক্‌ইসকে গোভাঁ দরজার দিকে ঠেলে দিলো।

মুহূর্তমাত্র কি যেন ভেবে মার্ক্‌ইস দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেলো।

কারা-দ্বার আবার বন্ধ হলো।

—এগারো—

কোর্ট-মার্শাল : ১৭৯৩।

লা তুর্গ্ দুর্গের একতলার হল ঘরে বসেছে বিচার-সভা।

তিনখানা চেয়ার। তিনটি টুল। একটি টেবিল। দুটো মোম বাতি।

টেবিলে পিতলের সিল-মোহর একটা, কিছুটা সিল করবার মোম, দুটো দোয়াতদান, কিছু সাদা কাগজ, আর আইন সংক্রান্ত দুখানি ছাপানো নির্দেশ-নামা।

কারা-কক্ষের দিকে মুখ করে পাতা হয়েছে টেবিল।

মাঝখানের চেয়ারটি ত্রিবর্ণ-পতাকায় সাজানো। সেটায় বসেছে সিমুরদ্যাঁ : বিচার-সভার সভাপতি। ডাইনের চেয়ারে বসেছে ক্যাপ্টেন গেসঁা, প্রথম বিচারক। বাঁয়ের চেয়ারে সার্জেণ্ট রাদুব : দ্বিতীয় বিচারক। তার মাথায় ব্যাণ্ডেজ।

টেবিলের দুই পাশের দুখানি টুলে বসেছে কমিশনার-অডিটার আর রেজিষ্ট্রার ; দু জনই সামরিক কর্মচারী।

টেবিলের উল্টো দিকের টুলটা খালি : সেটা বন্দীর আসন। দু পাশে সংগীনধারী দুই সৈনিক।

সিমুরদ্যাঁর টুপিতে ত্রিবর্ণ চিহ্ন। পাশে তরবারি। বেল্টে দুটো পিস্তল।

বেলা দুপুর।

বিচার এখনো সুরু হয় নাই।

একখানা সাদা কাগজে সিমুরদ্যাঁ লিখছে :

> গণ-নিরাপত্তা পরিষদের নাগরিক সদস্যগণ, লাঁতিনাক বন্দী। আগামী কাল তার মৃত্যুদণ্ড।

তারিখ, স্বাক্ষর ও সিল শেষ করে সিমুরদ্যাঁ চিঠিখানা পাশে-দাঁড়ানো একজন সৈনিককে দিলো। অভিবাদন করে সে বেরিয়ে গেলো।

বাইরে শোনা গেলো তার অশ্বক্ষুরধ্বনি।

সিমুরদ্যাঁ আদেশ করলো : কারাগারের দরজা খোলো।

দুইজন সৈনিক দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলো।

: বন্দীকে বাইরে নিয়ে এসো।

বেরিয়ে এলো গোভাঁ। দুপাশে দুই সৈনিক।

: গোভাঁ!—চীতকার করে উঠলো সিমুরদ্যাঁ।

: আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি।

: লাঁতিনাক কোথায়?

: মুক্ত।

: কে তাকে মুক্তি দিয়েছে?

: আমি?

: তুমি কি স্বপ্ন দেখছো?

: নিজ হাতে আমার সেনাপতির পোষাক আমি তার গায়ে জড়িয়ে দিয়েছি। চোখের উপর টেনে দিয়েছি টুপি।

ঃ এনে দাও লাঁতিনাককে।

ঃ গভীর রাতে তিনি এ-দুর্গ পরিত্যাগ করেছেন।

ঃ তুমি উন্মাদ।

ঃ আমি ঠিকই বলছি।

ঃ তাহলে তোমার শাস্তি—

ঃ মৃত্যু। আমি জানি।

সিমুরদ্যাঁর মুখ মরার মতো সাদা হয়ে গেলো। বিদ্যুত্স্পৃষ্টের মতো সে বসে রইলো—নিশ্চল, স্থানু। তাঁর গলার স্বর আটকে আসছে। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। কপালে জমেছে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম।

তবু সে বিচারক। সংকল্পে অটল।

প্রশ্ন করলো : আত্মপক্ষ সমর্থনে তোমার কি বলবার আছে?

ধীরে মাথা তুলে গোভাঁ বললো : একটি মাত্র কথা : একটা দিকে চোখ ছিলো বলে আরেকটা দিক আমি দেখতে পাই নি। একটি প্রত্যক্ষ স্পষ্ট মহত কায আমার চোখ থেকে মুছে ফেলেছিলো শত অন্যায়ের ছবি। এক দিকে এক বৃদ্ধ; অন্য দিকে তিনটি শিশু। তাদের চিন্তায় আমি ভুলে গেলাম অগ্নিদগ্ধ গ্রাম, রিক্ত মাঠ, বহু বন্দীর মৃত্যু, আহতের আর্তনাদ। আমি ভুলে গেলাম ইংলণ্ডের হাতে ফ্রান্সকে তুলে দেবার কলংক-কথা। আমার দেশকে যে খুন করেছে তাকে আমি মুক্ত করে দিলাম। আমি দোষী।

: আর কিছু বলবে ?

: হ্যাঁ। দলপতি হিসাবে আমার কর্তব্য আমি করেছি। আপনারাও করুন আপনাদের কর্তব্য। আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিন।

দুই হাত বুকের উপর ভাঁজ করে সিমুরদ্যাঁ বললো: বিচার হবে আইনের নির্দেশে। প্রত্যেক বিচারক ঘোষণা করবেন তাঁর অভিমত—উচ্চকণ্ঠে এবং অপরাধীর সামনে। ন্যায়ের কাছে লুকোচুরি নাই। প্রথম ভোট দিবেন ক্যাপ্টেন গেসাঁ।

ক্যাপ্টেন গেসাঁ দাঁড়ালো: আইনের নির্দেশ অপরিবর্তনীয়। সেনাপতি গোভাঁ বিদ্রোহী লাঁতিনাকের পলায়নে সাহায্য করেছেন। তিনি দোষী। আমার ভোট—মৃত্যু।

দৃঢ় স্পষ্ট গলায় গোভাঁ বললো: আপনাকে ধন্যবাদ।

সিমুরদ্যাঁ বললো: এবার ভোট দিবেন সার্জেন্ট রাতুব।

গোভাঁকে সামরিক কায়দায় অভিবাদন করে রাতুব বললো: এই যদি বিচার হয়, তাহলে গিলোটিনের খড়গ পড়ুক আমার গলায়। সে-বৃদ্ধ যা করেছেন, আমি হলেও তাই করতাম। আমার সেনাপতি যা করেছেন, আমি হলেও তাই করতাম। এরা বীর, এরা মহান। আর আপনারা চান সেনাপতিকে গিলোটিন করতে। আপনাদের কথা শুনে আমার হাসি পায়। না না, সে হবে না—হতে পারে না।

উত্তেজনার ফলে রাতুবের ব্যাণ্ডেজ ভিজে রক্তধারা গড়িয়ে পড়ছে ঘাড় বেয়ে।

সিমুরদ্যাঁ শুধালো : আপনি তাহলে আসামীর মুক্তির স্বপক্ষে ভোট দিতে চান ?

: আমি ভোট দেই—তাঁকে প্রজাতন্ত্রের সর্বাধিনায়ক করা হোক।

: বাজে কথা রেখে বলুন,—মুক্তি না মৃত্যু।

: আমি ভোট দেই—তাঁর বদলে আমার মাথা কেটে ফেলা হোক।

সিমুরদ্যাঁ বললো : লিখুন রেজিস্ট্রার—মুক্তি।

লেখা শেষ করে রেজিস্ট্রার ঘোষণা করলো : এক ভোট : মৃত্যু। এক ভোট : মুক্তি। সমান সমান।

এবার সিমুরদ্যাঁর ভোটের পালা।

সে উঠে দাঁড়ালো। টুপি খুলে রাখলো টেবিলে। ধীর অথচ গম্ভীর গলায় বললো : আসামী, প্রজাতন্ত্রের নামে এই বিচার-সভা তোমাকে ২—১ ভোটে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করলো।

সিমুরদ্যাঁ কি পাথর !

আসনে বসে সে টুপি তুলে দিলো মাথায়। বললো : গোভাঁ, আগামী কাল সূর্যোদয়ের সংগে সংগে তোমাকে গিলোটিন করা হবে।

অভিবাদন জানিয়ে গোভাঁ বললো : বিচার-সভাকে ধন্যবাদ।

সার্জেণ্ট রাদুব মূর্চ্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলো।

—বারো—

গভীর রাত।

একটা লণ্ঠন হাতে নিয়ে চলেছে সিমুরদ্যাঁ।

হল ঘর অতিক্রম করে শান্ত্রীকে ইংগিত করলো কারা-কক্ষের দরজা খুলে দিতে।

এক কোণে ঘুমিয়ে আছে গোভাঁ। তৃণ-শয্যা।

লণ্ঠনটা নামিয়ে অতি সন্তর্পণে এগিয়ে গেলো সিমুরদ্যাঁ। এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো গোভাঁর মুখের দিকে। মায়ের দৃষ্টি কি এর চেয়ে স্নেহময়?

হাঁটু গেড়ে বসে গোভাঁর একখানি হাত তুলে নিলো। গভীর আবেগে একটি চুমো খেলো।

চমকে জেগে উঠলো গোভাঁ। ম্লান আলোয় দেখলো সিমুরদ্যাঁর স্বপ্নাচ্ছন্ন মুখ।

বললো: মাষ্টার মশায়, আপনি? আমি স্বপ্ন দেখছিলাম, মৃত্যুর ঠোঁট ছুঁয়েছে আমার হাত।

সিমুরদ্যাঁ ডাকলো: গোভাঁ—

: বলুন মাষ্টার মশায়।

তাঁর পাশে খড়ের উপর বসে সিমুরদ্যাঁ বললো: আমি এসেছি তোমার সাথে একত্রে আহার করতে।

এক টুক্‌রা রুটি ছিঁড়ে গোভাঁ তাঁর হাতে দিলো। সিমুরদাঁার খাওয়া হলে এগিয়ে দিলো জলের কুঁজো।

সিমুরদাঁ বললে : আগে তুমি খাও।

গোভাঁ জল খেয়ে কুঁজোটা দিলো সংগীর হাতে। সিমুরদাঁ আকণ্ঠ পান করলো।

খেতে খেতে সুরু হলো আলোচনা।

গোভাঁ বললো : বিরাট ঘটনা-স্রোত বয়ে চলেছে। বিপ্লবের বর্তমান কাযগুলি রহস্যময়। কিন্তু এর অন্তরালে রয়েছে অদৃশ্য ভবিষ্যত। বর্বরতার ফাঁসি-মঞ্চের তল হতে ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে সভ্যতার মণি-মন্দির।

সিমুরদাঁ যোগ দিলো : ঠিক বলেছ। বিপ্লবের অস্থায়ী কর্মস্রোতের ভিতর দিয়েই একদিন দেখা দেবে এর স্পষ্ট স্বরূপ : অধিকার আর কর্তব্য চলবে পাশাপাশি : ন্যায্য করনীতি ; আবশ্যিক সামরিক জীবন ; জীবনের সর্বক্ষেত্রে সাম্যের প্রতিষ্ঠা ; আর সকলের উপরে আইন।

গোভাঁ বাধা দিলো কথার স্রোতে : আমার দৃষ্টি আরো উপরে।

: আইনের উপরে আবার কি আছে ?

: ন্যায় বিচার।

: স্পষ্ট করে বলো।

: যেমন—আপনি চান আবশ্যিক সামরিক জীবন। কিন্তু যুদ্ধ কার বিরুদ্ধে ? অন্য মানুষের। আমি চাই সামরিক

জীবনের লোপ। আমি চাই শান্তি। আপনি চান নির্যাতিতের উদ্ধার। আমি চাই নির্যাতনের অবসান। আপনি চান আয় অনুপাতে কর। আমি চাই কর বিলোপ। আমি চাই মানুষের জীবনযাত্রার খরচ নেমে আসুক একেবারে নিচের কোঠায়। আর সে ব্যয় বহন করুক সমাজের উদ্বৃত্ত অর্থ।

ঃ তার মানে ?

ঃ মানে এই ঃ প্রথমে পরগাছা-বৃত্তির নিপাত করুন—পুরোহিত, বিচারক আর সৈনিকের পরগাছা-বৃত্তি। তারপর কাযে লাগান আপনাদের সঞ্চিত অর্থ। প্রতি জমিতে সার দিন। মোট জমির চার ভাগের তিন ভাগ আজ পতিত। সারা ফ্রান্সকে চষে ফেলুন। অপ্রয়োজন গো-চারণ ভূমির উচ্ছেদ করুন। সমান ভাবে ভাগ করে দিন সমস্ত জমি। জন প্রতি একটি করে গোলা দিন, আর গোলা প্রতি একটি মানুষ। দেখবেন মোট ফসল শত গুণ বেড়ে যাবে।

আজ ফ্রান্সের চাষীরা মাংস খেতে পায় বছরে মাত্র চারদিন। জমি চাষের সুব্যবস্থা করে দিন, সারা ইওরোপকে সে পেট ভরে খাওয়াতে পারবে।…প্রকৃতি মানুষের এক বিস্ময়কর অনাদৃত বন্ধু। তাকে কাজে লাগান। প্রতিটি বাতাস, প্রত্যেকটি জলপ্রপাত আর বিদ্যুত-চমককে কাযে লাগান। মাটির নিচে প্রসারিত রয়েছে অসংখ্য শিরা-উপশিরা। তাদের ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছে জল, তেল আর আগুনের সীমাহীন প্রবাহ। সেই সব শিরা কেটে দিন। সেই জলে আপনার ঝরণার শক্তি

বৃদ্ধি হোক। সেই তেলে জ্বলুক আপনার আলো। সেই আগুনে জ্বলুক আপনার উনুন। চেয়ে দেখুন সমুদ্র-তরংগের দিকে। কী এক বিরাট শক্তি অকেজো হয়ে পড়ে আছে। নির্বোধ পৃথিবীর মানুষ তাকে কোন কাযে লাগায় না।

: তুমি একেবারে স্বপ্নের মেঘে পাল তুলে দিয়েছ গোভাঁ!

: আজ্ঞে না। এই বাস্তব সত্য। তারপর ধরুন স্ত্রীলোক। তাদের আপনি কি করবেন?

: তারা যেখানে আছে সেখানেই থাক—পুরুষের দাসী।

: বেশ। কিন্তু এক সর্তে।

: কি?

: পুরুষ হবে স্ত্রীলোকের দাস।

: তুমি বলো কি? পুরুষ হবে দাস। অসম্ভব। পুরুষ প্রভু। নিজের ঘরে সে রাজা।

: হ্যা তাই। কিন্তু এক সর্তে।

: কি?

: নারী হবে সেখানে রাণী।

: তাহলে তুমি বলতে চাও নর ও নারী হবে—

: সমান।

: সমান? এ-কথা তুমি ভাবতে পারো? তারা যে আলাদা জীব।

: আমি বলেছি তারা সমান। তারা এক, এমন কথা তো বলি নাই।

একটু চুপ করে থেকে সিমুরদ্যাঁ শুধালো : আর ছেলেমেয়ে ? তাদের তুমি কোন্ ভাগে ফেলবে ?

: প্রথমে জন্মদাতা পিতার ভাগে ; তারপরে জন্মদায়িনী জননীর ভাগে ; তারপরে শিক্ষাদাতা শিক্ষকের ভাগে ;তারপরে নগরের ভাগে ; তারপর দেশের ভাগে ; আর সর্বশেষে মনুষ্যত্বের ভাগে।

: ঈশ্বরের কথা তো তুমি বললে না ?

: বাবা, মা, শিক্ষক, নগর, দেশ, মনুষ্যত্ব—ঈশ্বরের কাছে যাবার এরাই তো সিঁড়ি। এই সিঁড়ি পার হলেই ঈশ্বরের দেশ ; স্বর্গের দুয়ার তো সেখানেই খোলা।

বলতে বলতে গোভাঁর স্বরে লাগলো স্বপ্নের ছোঁয়াচ ; আপন মনে সে বলেই চললো : কেবল বোঝা বয়ে বেড়াবার জন্যে মানুষ জন্মে নাই। না, না, কেউ আর অস্পৃশ্য থাকবে না, দাস থাকবে না, দণ্ডিত থাকবে না, নির্যাতিত থাকবে না। পরের জোয়াল কেউ আর কাঁধে নেবে না। পরের শিকল টানবার জন্য মানুষ জন্মে নাই, সে জন্ম নিয়েছে আকাশে উড়তে। সাপের মতো মানুষ আর বুকে হাঁটবে না। সোনার পাখা সে মেলবে সুনীল আকাশে। আমি চাই মাটির কীট জীবন্ত ফুল হয়ে উড়ে যাবে। আমি চাই—

মাঝ পথে থেমে গেলো গোভাঁর কণ্ঠস্বর। তাঁর চোখ জ্বলছে। ঠোঁট কাঁপছে।

খোলা দরজা দিয়ে ভেসে আসে বাইরের শব্দ। অনেক

দূরে ভেরীর আওয়াজ। কানে আসে হাতুড়ির শব্দ। লোহা লক্করের ঠক্ ঠক্ শব্দ।

সিমুরদ্যা কান পেতে শুনলো। তার মুখ সাদা হয়ে গেলো ছাইয়ের মতো।

গোভাঁ কিন্তু শুনলো না কিছুই। গভীর ধ্যানে সে মগ্ন।

সিমুরদ্যা শুধালো : কি ভাবছ ?

: ভবিষ্যত। গোভাঁ উত্তর দিলো।

আবার চুপ।

গোভাঁর স্বপ্নবিভোর চোখ বুজে এলো। অকম্পিত স্থির তার দেহ।

সিমুরদ্যা উঠলো।

ধ্যানমগ্ন যুবকের দিকে চোখ রেখে ধীরে ধীরে পিছিয়ে এলো দরজার কাছে। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেলো।

কারাকক্ষের দরজা আবার বন্ধ হলো।

—তেরো—

দিকচক্রবালে ঊষার রক্তিম পদচিহ্ন।

ক্জারের অস্পষ্ট বন-রেখাকে অতিক্রম করে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে তুটি মূর্তি : তুটি ছায়াচ্ছন্ন দানব যেন।

একটি—লা তুর্গ্ দুর্গ।

অপরটি—সদ্যনির্মিত গিলোটিন। রাতারাতি মাটি ফুঁড়ে উঠেছে বুঝি রক্তপিপাসু সয়তান।

লা তুর্গ্ : দীর্ঘ দেড় হাজার বছরের প্রস্তর-রূপ : দাসত্ব ও সামন্ততন্ত্রের মূর্ত প্রতীক।

গিলোটিন : ১৭৯৩-র একটি বছরের কাষ্ঠ-রূপ : সংখিপ্ত একটি বছর পনেরোটি শতাব্দীর সকল প্রতিদ্বন্দ্বী।

লা তুর্গ্ : রাজতন্ত্র।

গিলোটিন : বিপ্লব।

তুই শক্তি আজ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।.........

দূরে ড্রাম বেজে উঠলো।

প্রভাতের শান্ত স্তব্ধতা খান খান হয়ে ভেঙে পড়লো।

ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে এলো মৃত্যু-শোভাযাত্রা।

প্রথমে ড্রামবাদক দল। তারপর সংগীনধারী সৈন্য। তারপর উন্মুক্ত কৃপাণধারী একদল সৈন্য। পিছনে গোভাঁ। পরিমিত পদক্ষেপে সে এগিয়ে চলেছে। তার হাতে

শিকল নাই। পায়েও না। কোমরে তরবারি। সকলের পিছনে আর একদল সৈনিক।

মৃত্যু-যাত্রা মঞ্চের নিচে এসে থামলো।

গোভাঁ মঞ্চের উপরে উঠে দাঁড়ালো। সরল, শান্ত, সুন্দর মুখে পড়েছে প্রথম সূর্যের লাল আলো। বাতাসে উড়ছে বাদামী চুল।

একজন অফিসার খুলে নিলো তার তরবারি। জল্লাদ এগিয়ে এলো দড়ি নিয়ে। এইবার তাকে বাঁধতে হবে।

গোভাঁ বললো : অপেক্ষা করো।

ডান হাত তুলে সিমুরদ্যাঁকে জানালো শেষ বিদায়-সম্ভাষণ।

উচ্চকণ্ঠে বললো : বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।

তাকে শুইয়ে দেওয়া হলো পাটাতনের উপর। জল্লাদ সযত্নে দুই ভাগ করে দিলো চুলগুলি। তারপর স্প্রিং-এ হাত দিলো।

স্প্রিংটা ঘুরছে। প্রথমে আস্তে। তারপর জোরে। তারপরে একটা ভীষণ শব্দ—

ঠিক সেই মুহূর্তে আর একটি শব্দ হলো।

গিলোটিনের খড়্গের শব্দের প্রতিধ্বনি হলো পিস্তলের শব্দে।

সিমুরদ্যাঁ পিস্তলের গুলি ছুড়েছে নিজের বুকে। তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো কয়েক ঝলক রক্ত।

তারপর সব শেষ